লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

নব পর্যায় ৮২ বর্ষ | ৯ম সংখ্যা

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো ‘পরে
Love for All
Hatred for None

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১ অগ্রহায়ন, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ | ১৭ রবি. আউ., ১৪৪১ হিজরি | ১৫ নবুয়ত, ১৩৯৮ হি. শা. | ১৫ নভেম্বর, ২০১৯ ঈসাব্দ

UNESCO Headquaters
Place de Fontenoy in Paris, France

দোয়ার রীতিতে মহানবী (সা.)-এর সুন্নত জীবন্ত রাখতে হুযূর (আই.)-এর তাজা নির্দেশনা

নিম্নবর্ণিত আয়াত পাঠ এবং সূরাসমূহ প্রতিরাতে ঘুমানোর পূর্বে তিনবার পড়ে নিয়ে নিজ হাতের মুঠিতে ফুঁ দিয়ে সমস্ত শরীরে (যতটুকু হাত যায়) বুলিয়ে নিবেন কেননা আমাদের প্রিয় রসূলে করীম (সা.)-এর পছন্দনীয় প্রাত্যহিক রীতি ছিল এটি।

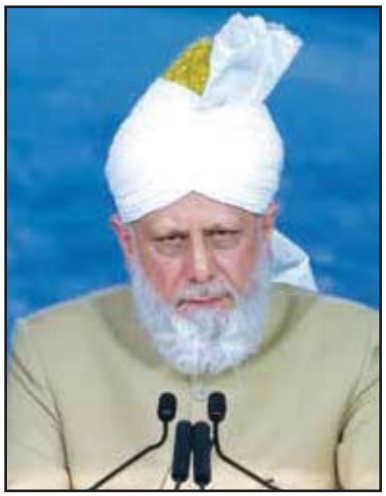

আয়াতুল কুরসী

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ۚ لَا تَاۡخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوۡمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الۡاَرۡضِ ؕ مَنۡ ذَا الَّذِیۡ یَشۡفَعُ عِنۡدَهٗۤ اِلَّا بِاِذۡنِهٖ ؕ یَعۡلَمُ مَا بَیۡنَ اَیۡدِیۡهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ ۚ وَلَا یُحِیۡطُوۡنَ بِشَیۡءٍ مِّنۡ عِلۡمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ کُرۡسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ ۚ وَلَا یَـُٔوۡدُهٗ حِفۡظُهُمَا ۚ وَهُوَ الۡعَلِیُّ الۡعَظِیۡمُ ﴿۲۵۶﴾

(তিনিই) আল্লাহ্, যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নাই। তিনি চিরঞ্জীব-জীবনদাতা (ও) চিরস্থায়ী-স্থিতিদাতা। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। আকাশসমূহে যা আছে ও পৃথিবীতে যা আছে সব তাঁরই। কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে? তাদের সামনে যা আছে এবং তাদের পিছনে যা আছে (সবই) তিনি জানেন। তারা তাঁর জ্ঞানের কোন নাগালই পায় না তবে (এ ক্ষেত্রে) তিনি যতটুকু চান (শুধু ততটুকুই)। তাঁর সিংহাসন আকাশসমূহ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত। এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। আর তিনি অতি উঁচু, মহামহিমান্বিত। (সূরা আল বাকারা: ২৫৬)

সূরাতুল ইখলাস

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ﴿۱﴾

قُلۡ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴿۲﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿۳﴾ لَمۡ یَلِدۡ ۬ۙ وَلَمۡ یُوۡلَدۡ ﴿۴﴾ وَلَمۡ یَکُنۡ لَّهٗ کُفُوًا اَحَدٌ ﴿۵﴾

১) আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। ২) তুমি বল, তিনিই এক-অদ্বিতীয় আল্লাহ্। ৩) আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ (ও) সর্বনির্ভরস্থল। ৪) তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয় নি। ৫) আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

সূরাতুল ফালাক

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ﴿۱﴾

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ الۡفَلَقِ ﴿۲﴾ مِنۡ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿۳﴾ وَمِنۡ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ﴿۴﴾ وَمِنۡ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الۡعُقَدِ ﴿۵﴾ وَمِنۡ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿۶﴾

১) আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। ২) তুমি বল, আমি বিদীর্ণকরণের মাধ্যমে (নতুন কিছু সৃষ্টিকারী) প্রভুর আশ্রয় চাই। ৩) (আমি আশ্রয় চাই) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন এর অনিষ্ট থেকে। ৪) এবং অন্ধকার বিস্তারকারীর অনিষ্ট থেকে যখন তা ছেয়ে যায়। ৫) এবং সম্পর্ক-বন্ধনে (বিচ্ছেদ সৃষ্টির জন্য) ফুৎকারকারিনীদের অনিষ্ট থেকে। ৬) এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকেও যখন সে হিংসা করে।

সূরাতুন নাস

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ﴿۱﴾

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿۲﴾ مَلِکِ النَّاسِ ﴿۳﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ﴿۴﴾ مِنۡ شَرِّ الۡوَسۡوَاسِ ۙ الۡخَنَّاسِ ﴿۵﴾ الَّذِیۡ یُوَسۡوِسُ فِیۡ صُدُوۡرِ النَّاسِ ﴿۶﴾ مِنَ الۡجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿۷﴾

১) আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। ২) তুমি বল, আমি মানুষের প্রভুপ্রতিপালকের কাছে আশ্রয় চাই, ৩) (যিনি) মানুষের অধিপতি ৪) (এবং) মানুষের উপাস্য। ৫) (আমি তাঁর আশ্রয় চাই) কুপ্ররোচনা সৃষ্টিকারীর অনিষ্ট থেকে, যে কুপ্ররোচনা দিয়ে সটকে পড়ে, ৬) (এবং) যে মানুষের অন্তরে কুপ্ররোচনা দেয়, ৭) সে জিনের (অর্থাৎ উঁচু শ্রেণীর মানুষের) মাঝ থেকেই হোক বা সাধারণ মানুষের মাঝ থেকেই হোক।

(জুমুআর খুতবা: ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮)

সম্পাদকীয়

অধরা শান্তি ধরাপৃষ্ঠে ধরে রাখতে হলে মহানবী(সা.)-এর আদর্শ অনুশীলনের বিকল্প নেই

ধর্ম প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব বিষয়। বিষয়টি আত্মিক, তাই কোন ব্যক্তির বিশ্বাস সম্পর্কে মন্দ কথা বলার অধিকার কারও নেই। অন্যরা যেটিকে পবিত্র বলে বিবেচনা করে; সেটিকে বিদ্রূপ করা কারোরই উচিত নয়, কারণ অন্য লোকের বিশ্বাসের প্রতি উপহাস ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হলে তা তাকে ব্যথাতুর এবং যন্ত্রণাকাতর করে আর এভাবে বিভাজন সৃষ্টি হয়।

অপরদিকে, সহনশীলতা এবং পারস্পরিক সম্মান-বোধ হল সেই মূল-ভিত্তি যার মাধ্যমে শান্তিময় ও সামঞ্জস্যপূর্ণ এক সমাজ গড়ে উঠতে পারে।

শান্তি এমন এক জিনিস, যা আমরা প্রত্যেকেই কামনা করি আর তা ব্যক্তিগত স্তরে আর বিস্তৃত অঙ্গনেও। এটি এমন একটি বিষয়, যা বিভিন্ন জাতি এবং সম্প্রদায় নিজেদের জন্য আকুলভাবেই কামনা করে।

শান্তির দু'টি ধরণ রয়েছে; বাহ্যিক শান্তি এবং অভ্যন্তরীণ শান্তি। বাহ্যিক শান্তির ক্ষেত্রে ব্যক্তি-স্তরে লোকদের খুশি এবং সন্তুষ্ট দেখা গেলেও; প্রায়শঃই তারা অভ্যন্তরীণ শান্তি বোধ করে না।

বাস্তবতা হল কোনও ব্যক্তি যতক্ষণ অন্তরে প্রশান্তি লাভ না করে ততক্ষণ তাদের বস্তুগত স্বাচ্ছন্দ্য মূল্যহীন। সহজ কথায় বলতে গেলে, অর্থ দিয়ে যে জিনিসটি ক্রয় করা যায় না তা-ই হল অভ্যন্তরীণ শান্তি তথা আত্মিক প্রশান্তি।

দুঃখের বিষয়, উন্নত ও উন্নয়নশীল– এ উভয় দেশের ক্ষেত্রেই নাগরিকদের মানসিক স্বাস্থ্যসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি ক্রমশঃ বাড়ছে। আর্থিক সংস্থানে তুলনামুলকভাবে বিত্তশালী হলেও ধনী দেশগুলিতে হতাশাগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হারে বেড়েই চলছে।

ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে আজকের এ সমস্যার সমাধান বেশ সহজ। কারণ ইসলামের নবী (সা.) শিখিয়েছেন যে, সত্যিকারের মানসিক প্রশান্তির প্রয়োজনে একজন ব্যক্তির উচিত সর্বশক্তিমান সত্ত্বা আল্লাহ্'কে শনাক্ত করা এবং তাঁর সাথে সংযোগ স্থাপন করা। কেননা একমাত্র তিনিই হলেন শান্তির একমাত্র উৎস।

ইসলামের একটি সুবর্ণ-নীতি হল এক মুসলমান, নিজের জন্য যা পছন্দ করে অন্যের জন্যও তার একই পছন্দ করা উচিত। সোনালী এই নীতিটি যদি সকল ক্ষেত্রে মেনে চলা হয় তবেই সমাজে শান্তি হবে টেকসই ও স্থায়ী।

এটিই হল আদর্শ সমাজের আভিজাত্য-চিহ্ন আর উদারতার এই চেতনা ইসলাম জাগরুক রাখে। ইসলাম এমন একটি ধর্ম এবং শিক্ষা, যা মানুষকে সমস্ত স্বার্থপরতা ত্যাগ করার আহ্বান জানায়।

আধুনিক যে সমাজ, তা স্বার্থ এবং লোভের গ্রাসে আচ্ছন্ন। ন্যায়বিচারের নীতিগুলি ধারাবাহিকভাবে বাতিল করার কারণে বিশৃঙ্খলা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ ক্রমেই বেড়ে চলছে।

আধুনিক ইতিহাসের এটি একটি অবিচল ধারা যে প্রভাবশালী শক্তিধর রাষ্ট্র শান্তি প্রতিষ্ঠার অজুহাতে দূরবর্তী অঞ্চলে তাদের সেনাবাহিনী প্রেরণ করছে, তাদের নিক্ষিপ্ত গুলি বা বোমায় নিরীহ নারী ও শিশু সহ শত শত; এমনকি হাজার হাজার বেসামরিক মানুষের মৃত্যু ঘটলেও তারা চুপটি করে থাকে এবং আফসোস বা অনুশোচনা পর্যন্ত প্রকাশ করে না।

অবশ্যই, বর্তমান বিশ্বে বিভাজনের বেশিরভাগেরই কারণ হল জড়িত পক্ষগুলির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য স্বচ্ছ তো নয়ই স্বার্থপরতা দুষ্ট।

ফলে আশাহত ও হতাশ যুবকরা উগ্র আলেম বা চরমপন্থীদের সহজ শিকারে পরিণত হয় আর এই হতাশাগ্রস্তদের মন বিষিয়ে তুলে স্বার্থান্বেষী মহল নিজেরা ফায়দা লুটে।

অবশ্যই এ থেকে মানুষকে রক্ষা করতে হবে, অন্যথায়, ঘৃণার তিক্ত চক্র আধুনিক বিশ্বকে অন্ধকার করে দিয়ে মুসলিম সমাজ তথা বৃহত্তর বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে সুদূর পরাহত।

তাই, ব্যবধান পিছনে ফেলে বিশ্বে সত্য ও টেকসই শান্তি বিকাশের লক্ষ্যে বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করা এখন সময়ের দাবী। একে অপরকে শ্রদ্ধা এবং ঐক্যের নীতি ও সাধারণ মঙ্গলাঙ্খাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠা উন্নততর সমাজ সুসংবদ্ধ রাখতে সকলকেই প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

আল্লাহ্ তা'লা সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভবুদ্ধি দান করুন, এটাই আমাদের একান্ত প্রত্যাশা।

সূচিপত্র

১৫ নভেম্বর ২০১৯

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃতবাণী ৫

ইযালায়ে আওহাম (২য় অংশ) ৬

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ মোতাবেক ২০ তবুক, ১৩৯৮ হিজরী শামসী'র **জুমুআর খুতবা মহানবী (সা.)-এর সাহাবী (রা.)-'গণের পুণ্যময় স্মৃতিচারণ** ৯

Islamic Principles on Education and Serving Humanity ১৮
Address by the Worldwide Head of the Ahmadiyya Muslim Community at the UNESCO Headquarters in Paris, France

শিক্ষা বিস্তার ও মানবসেবা প্রদানের ইসলামী নীতিমালা নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-এর ঐতিহাসিক ভাষণ ২৫
[গত ৮ অক্টোবর ২০১৯ ইউনেস্কোর সদর দপ্তর ফ্রান্সের প্যারিসে হুযূর (আই.) অনবদ্য এ ভাষণটি প্রদান করেন।]

কলমের জিহাদ ৩০
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মন্ডল

নাস্তিকদের ধারণা সত্য নয় কেন? ৩৩
সৃষ্টির রহস্য উন্মোচন করে স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ
খন্দকার আজমল হক

'ইমাম আখেরুজ্জামান'-এর সতর্কবাণী– ৩৭
হে এশিয়া তুমিও নিরাপদ নহ
হে ইউরোপ তুমিও নিরাপদ নহ
কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

কবিতা– প্রশংসা ৩৩
শাহ হকিব উদ্দিন

সংবাদ ৪০

বিবাহ সংবাদ ৪৪

পাক্ষিক 'আহমদী' নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন পাক্ষিক **'আহমদী'**র সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে **'আহমদী'** পত্রিকা পড়তে **Log in** করুন
www.theahmadi.org
পাক্ষিক 'আহমদী'র নতুন ই-মেইল আইডি–
pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com

কুরআন শরীফ

সূরা আল্ কাহ্‌ফ-১৮

وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا
فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ
صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّاۤ اَحْصٰىهَا ۚ وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا
حَاضِرًا ؕ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ﴿۵۰﴾

৫০। আর (তাদের আমলনামার) কিতাব তাদের সামনে রেখে দেয়া হবে। তখন তাতে যা (লেখা) আছে সেজন্য তুমি এ অপরাধীদের ভীতসন্ত্রস্ত দেখতে পাবে। তারা বলবে, 'হায়! আমাদের জন্য দুর্ভোগ, এটা কেমন কিতাব যা ছোট বড় কোন কিছু বাদ দেয় নি! বরং এটি এসব কিছুকে সংরক্ষণ করে রেখেছে।' আর তারা যা কিছু করে এসেছে তা তারা (নিজেদের) সামনে দেখতে পাবে। আর তোমার প্রভু-প্রতিপালক কারো প্রতি অবিচার করেন না।

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ
اِبْلِيْسَ ؕ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ ؕ
اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗۤ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِيْ وَهُمْ
لَكُمْ عَدُوٌّ ؕ بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا ﴿۵۱﴾

৫১। আর (স্মরণ কর) আমরা যখন ফিরিশ্‌তাদের বলেছিলাম, 'তোমরা আদমের জন্য সিজদাবনত হও' তখন ইবলিস ছাড়া তারা (সবাই) সিজদা করলো। সে ছিল জিনদের একজন। সুতরাং সে তার প্রভু-প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করলো। অতএব তোমরা কি আমার পরিবর্তে তাকে ও তার পরবর্তী প্রজন্মকে নিজেদের বন্ধু বানাচ্ছো, অথচ তারা তোমাদের শত্রু? যালেমদের জন্য বিনিময় অতি মন্দ হয়ে থাকে।

مَاۤ اَشْهَدْتُّهُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَا خَلْقَ
اَنْفُسِهِمْ ۪ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيْنَ عَضُدًا ﴿۵۲﴾

৫২। আমি আকাশসমূহের ও পৃথিবীর সৃষ্টিলগ্নে এবং তাদের নিজেদের সৃষ্টির সময়ও তাদেরকে সাক্ষী করি নি[১৬৯৯]। আর আমি পথভ্রষ্টকারীদের কখনো সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করতে পারি না।

وَيَوْمَ يَقُوْلُ نَادُوْا شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ
فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ
مَّوْبِقًا ﴿۵۳﴾

৫৩। আর (স্মরণ কর) যেদিন তিনি বলবেন, 'যাদেরকে তোমরা আমার শরীক বলে মনে করতে তোমরা তাদের ডাক।' তখন এরা তাদের ডাকবে। কিন্তু তারা এদের কোন উত্তর দিবে না। আর আমরা এদের (এবং এদের কল্পিত শরীকদের) মাঝে এক ধ্বংসের দেয়াল[১৭০০] দাঁড় করিয়ে দিব।

وَرَاَ الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْۤا اَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوْهَا
وَلَمْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿۵۴﴾

৫৪। আর অপরাধীরা আগুন দেখে বুঝবে তারা এতে পড়তে যাচ্ছে। আর তারা এ থেকে বেরিয়ে পালাবার কোন পথ খুঁজে পাবে না[১৭০১]।

১৬৯৯। এই আয়াতের মর্মার্থ হতে পারে, সেই সময় পৃথিবীতে নতুন সমাজ ব্যবস্থার কথা লোকমুখে চলতে থাকবে যা পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তির যুগের আগমনবার্তা ঘোষণা করবে এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তার তথাকথিত নেতৃবৃন্দ তা প্রতিষ্ঠা করার দাবীদার বনে যাবে। কিন্তু তাদের কেউই এই প্রচেষ্টাতে সফলকাম হতে পারবে না। কারণ আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং নিজের জন্য এই মহত্তম কাজের পরমোৎকর্ষতা সংরক্ষিত রেখেছেন।

১৭০০। এই আয়াতে প্রতিভাত হয় যে, এই জাতিসমূহ উচ্চ কর ও মাশুলের বাধা, দেয়াল বা লৌহযবনিকা সৃষ্টি করবে এবং একে অন্যের উপরে অর্থনৈতিক বাধা বা বয়কট পদ্ধতি আরোপ করবে। অথবা এর মর্ম এও হতে পারে, তারা মারাত্মক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে যা তাদেরকে ধ্বংস করে দিবে।

১৭০১। পাশ্চাত্যের অধিবাসী জাতিসমূহ এক ভয়ানক যুদ্ধ নিকটবর্তী হতে দেখবে, তা এড়িয়ে যেতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে। কিন্তু এই বিষয়ে তাদের সকল চেষ্টাচরিত্র ব্যর্থ হবে। পাশ্চাত্যের জাতিসমূহ পূর্বেও দু'টি ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে যা জগতে তাদের রাজনৈতিক মর্যাদা এবং কর্তৃত্ব প্রায় বিনষ্ট করে দিয়েছে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল ভিত্তি পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়েছে। তৃতীয় এক ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ সম্ভবত সমস্ত পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছে।

হাদীস শরীফ

যারা নিজের ঈমানের ওপর অবিচল থাকেন আল্লাহ্ তা'লা তাদের পুরস্কৃত করেন

কুরআনঃ

নিশ্চয় যারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্,' অতঃপর তারা দৃঢ়তার সাথে অবিচল থাকে, তাদের ওপর ফিরিশ্‌তাগণ নাযেল হয় (এই বলে), তোমরা ভয় করিও না এবং দুঃখিত হয়ো না এবং সেই জান্নাতের জন্য তোমরা আনন্দিত হও যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে।" *(সূরা হামীম আস্ সাজ্‌দা)*

হাদীসঃ

হযরত সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি বললাম হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি আমাকে ইসলামের ব্যাপারে এমন কথা বলুন যেন আপনি ছাড়া অন্য কাউকে আর সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে না হয়।" তিনি (সা.) বললেন, **"বল! আমি আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছি তারপর এর ওপর অবিচল হয়ে যাও।"** *(মুসলিম)*

ব্যাখ্যাঃ

যুগে যুগে যারা আল্লাহ্‌র বাণীকে মানবজাতির কাছে পৌঁছে দিয়েছেন তাদের বড় বড় বাঁধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে। এমনকি সত্যের জন্য নিজের জানমাল আত্মীয়-স্বজনকে ত্যাগ করতে হয়েছে। সত্যের ওপর অবিচল হয়ে যাওয়া একটি মহান গুণ আর এ গুণের চরম বিকাশস্থল হলেন আল্লাহ্‌র নবীগণ। তারা নিজেদের জীবনে ইস্তেকামাত ও ধৈর্য্য দেখিয়ে তাদের অনুসারীদের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে থাকেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যারা আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান আনার পর ঈমানের জন্য অবিচল থাকে, পৃথিবীর কোন বিরোধিতার পরওয়া করে না-খোদা তা'লা তাদের হৃদয়কে প্রশান্তি দেন। তিনি তাদের জন্য জান্নাত রেখেছেন। অর্থাৎ, সত্যকে গ্রহণ করার পর তারা নিজেদের জীবনকে সত্যের ওপর পরিচালিত করে। এর ফলে তাদের কর্ম তাদেরকে জান্নাতের হকদার করে দেয়।

উপরোক্ত হাদীস হতে এ বিষয়টি জানা যায় যে, আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান আনার পর এর ওপর নিষ্ঠাবান ও অবিচল থাকলে পৃথিবী কিছুই করতে পারবে না। আল্লাহ্‌কে এক অদ্বিতীয় মানার পর তাঁর সাথে কোন ধরনের অংশীদার না করা আসল বিষয়। সকল মিথ্যা হতে মুক্ত হয়ে– **ওয়াহেদ লা শারীক**– 'অংশীবিহীন এক' খোদার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করলে কোন ধরনের ভয়ের আশঙ্কা থাকবে না। আর এ সব কিছু নির্ভর করে আল্লাহ্‌র মনোনীত ব্যক্তির আনুগত্যের মধ্যে। তিনিই সেই সত্ত্বা যিনি আমাদেরকে অবহিত করেন যে, কোন বিষয়টি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির কারণ আর কোনটি অসন্তুষ্টির। তাই হযরত রসূল করীম (সা.) বলছেন যে, এক-অদ্বিতীয় খোদার ওপর ঈমান এনে এ বিশ্বাসের ওপর অবিচল থাকলে তোমার কোন ভয় নেই। খোদা স্বয়ং তোমার অভিভাবক হয়ে যাবেন।

আল্লাহ্‌র পথে নানা ধরনের পরীক্ষা আসে-যাতে তিনি দেখেন যে, কে তার ওপর আস্থা রাখে। এভাবে যারা নিজের ঈমানের ওপর অবিচল থাকেন আল্লাহ্ তাআলা তাদের পুরস্কৃত করেন। আল্লাহ্ করুন আমরা যেন আমাদের ঈমানে দৃঢ় প্রত্যয় দেখাই এবং খোদার আশিসের ভাগীদার হই, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

মুসলমানরা কুরআনের সুমহান শিক্ষাকে পরিত্যাগ করবে এবং এমন সব বিভ্রান্তিকর বিদা'তের অনুসরণ করবে যা কুরআন থেকে প্রমাণিত নয়

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

আল্লাহ্ তাঁর আদি জ্ঞানের ভিত্তিতে জানতেন, শেষ যুগে খ্রীষ্টান জাতি সত্য ধর্মের সঠিক পথের বিরোধিতা করবে এবং সম্মানিত প্রভুর পথে বাধা সৃষ্টি করবে ও প্রকাশ্য মিথ্যাচার করবে। একই সাথে তিনি এটিও জানতেন, সে যুগে মুসলমানরা কুরআনের সুমহান শিক্ষাকে পরিত্যাগ করবে এবং এমন সব বিভ্রান্তিকর বিদা'তের অনুসরণ তারা করবে যা কুরআন থেকে প্রমাণিত নয়। ধর্মের জন্য সহায়ক এবং মু'মিনদের ঈমানী পোষাকের সৌন্দর্য বর্ধনকারী বিষয়াবলীকে তারা পরিত্যাগ করবে। তারা বিদা'ত, কুপ্রবৃত্তি ও দুষ্কৃতিপরায়ণতার ধ্বংসাত্মক গহ্বরে পতিত হবে। নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা ও ধর্ম বলতে তাদের কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

এ যুগে দু'শ্রেণীর সীমালঙ্ঘনকারীদের সংশোধন ও মিথ্যাবাদীদের মুখ বন্ধ করার জন্য তখন অনুগ্রহ ও করুণার নিদর্শনস্বরূপ তিনি এক ব্যক্তিকে প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁর নিখুঁত পরিকল্পনার দাবি ছিল, প্রেরিত ব্যক্তির নাম খ্রীষ্টানদের সংশোধনের নিরিখে 'ঈসা' আর মুসলমানদের তরবিয়তের নিরিখে 'আহমদ' রাখা, এবং তাঁকে উভয় দলের রীতিনীতি ও পথ-ঘাট ভালভাবে অবগত করা।

অতএব তিনি তাঁকে উল্লেখিত দু'টো উপাধি দিয়েছেন এবং উভয় পানীয় থেকে পান করিয়েছেন আর তাঁকে মু'মিনদের দুঃখবিমোচনকারী ও খ্রীষ্টানদের নৈরাজ্য নির্মূলকারী নিযুক্ত করেছেন। অতএব খোদার দৃষ্টিতে একদিকে তিনি ঈসা এবং অপরদিকে আহমদ। সুতরাং তুমি বৈমাত্রেয় ভাইয়ের মত আচরণ পরিহার কর আর বিরোধিতা ও অন্যায়ের পথ এড়িয়ে চল, সত্যকে গ্রহণ করো আর কৃপণদের মতো হয়ো না। নবী (সা.) যেখানে তাঁকে মসীহ্-এর গুণে গুণান্বিত আখ্যা দিয়েছেন বরং তাঁকে ঈসা নাম দিয়েছেন আর তাকে তাঁর নিজ মহান সত্তার গুণে গুণান্বিত আখ্যায়িত করেছেন এবং মুস্তফা সদৃশ 'আহমদ' নামে অভিহিত করেছেন। তোমার জানা উচিত, তিনি যে এ দু'টো নাম পেয়েছেন তা দু'টো সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর আন্তরিক সমবেদনাপূর্ণ দৃষ্টির কারণে।

তুমি কি দেখছো না! আমাদের জাতি ধর্মীয় সংস্কার ও ধর্মীয় শিক্ষাকে কলুষিত করেছে? শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে করতে তাদের অধিকাংশের জ্ঞান জোনাকীর আলোর ন্যায় ক্ষীণ এবং তাদের আলেমরা মরুভূমির মরীচিকাতুল্য হয়ে গেছে। দুস্কৃতির অনুসরণ তাদের মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে এবং মানব স্বভাব বিরুদ্ধ সব অপকর্ম এক পর্যায়ে তাদের জন্য স্বভাবসিদ্ধ বাসনার রূপ নিয়েছে আর তারা নাছোড়বান্দার ন্যায় জাগতিকতার প্রতি আসক্ত হয়েছে।

সুতরাং খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের সংশোধনের উদ্দেশ্যে তাদের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি ও বন্দীর প্রতি সহমর্মীতার ন্যায় তাদের খাতিরে ব্যথিত হবার কারণে স্বর্গের অধিপতি তাঁকে ঈসা নাম দিয়েছেন। অনুরূপভাবে নবী (সা.)-এর উম্মতের জন্য তাঁর গভীর হিতাকাঙ্ক্ষিতার কারণে তাঁকে আহমদ নাম দিয়েছেন। তাদের ভয়াবহ মতভেদ এবং ঘৃণ্য জীবন দেখে তাঁর মর্মপীড়া আরও বেড়ে যায়। সুতরাং তোমার জেনে রাখা উচিত, প্রতিশ্রুত ঈসা-ই আহমদ আর প্রতিশ্রুত আহমদ-ই ঈসা। এ সমুজ্জ্বল রহস্যকে অবজ্ঞা করো না। তুমি কি অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা আর খ্রীষ্টানদের হাতে যা ঘটেছে তা দেখছো না?

তুমি কি দেখছো না! আমাদের জাতি ধর্মীয় সংস্কার ও ধর্মীয় শিক্ষাকে কলুষিত করেছে? শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে করতে তাদের অধিকাংশের জ্ঞান জোনাকীর আলোর ন্যায় ক্ষীণ এবং তাদের আলেমরা মরুভূমির মরীচিকাতুল্য হয়ে গেছে। দুস্কৃতির অনুসরণ তাদের মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে এবং মানব স্বভাব বিরুদ্ধ সব অপকর্ম এক পর্যায়ে তাদের জন্য স্বভাবসিদ্ধ বাসনার রূপ নিয়েছে আর তারা নাছোড়বান্দার ন্যায় জাগতিকতার প্রতি আসক্ত হয়েছে।

(সিররুল খিলাফাহ্ পুস্তকের বাংলা সংস্করণ পৃঃ ৭১-৭২ থেকে উদ্ধৃত)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

ইযালায়ে আওহাম (২য় অংশ)

(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

(৩৫তম কিস্তি)

প্রতিশ্রুত মসীহ্ হওয়ার প্রমাণ

এতে আদৌ কোন সন্দেহ নেই যে, ইস্রাঈলী নবী হযরত মসীহ্ বস্তুতপক্ষেই মৃত্যুবরণ করেছেন– এ সত্যটি প্রমাণ হয়ে যাওয়ার পর প্রত্যেক মুসলমানকে মানতে হবে যে, মৃত নবী পৃথিবীতে পুনরায় কখনও আসতে পারেন না। কেননা পবিত্র কুরআন এবং হাদীস ঐক্যবদ্ধভাবে এ বিষয়ে সাক্ষ্য দান করে যে, কোনো মৃত ব্যক্তি দুনিয়ায় কখনও ফিরে আসে না। কুরআন করীম **'ইন্নাহুম লা ইয়ারজিউন'** *[(আল্ আম্বিয়া: ৭৬) অর্থঃ 'নিশ্চয় তারা কখনও ফিরবে না')]* বলে চিরকালের জন্য এ দুনিয়া থেকে তাদের বিদায় দেয়।

উল্লেখ্য যে উযায়ার (আ.) প্রমুখ নবী সম্পর্কে কুরআন করীমে বর্ণিত বৃত্তান্ত এবং উপরুল্লেখিত বিষয়টির মাঝে কোন বিরোধ নেই। কেননা 'মওত' (বা মৃত্যু) শব্দটি নিদ্রা ও মূর্ছা যাওয়া অর্থেও বিদ্যমান। 'ক্বামুস' (অভিধান গ্রন্থ) দ্রষ্টব্য। আর উক্ত বৃত্তান্তে যে আস্থিগুলোর ওপর মাংসের আবরণ পরানোর উল্লেখ রয়েছে সেটি প্রকৃতপক্ষে এক আলাদা বিষয়ের বর্ণনা। এতে আল্লাহ্ তা'লা এ বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চেয়েছেন যে, মাতৃগর্ভে তিনি এক মৃতকেই জীবিত করেন এবং সেখানে তিনি আস্থিগুলোর ওপর মাংসের আবরণ পরিয়ে থাকেন। অতঃপর সেটিতে তিনি প্রাণ সঞ্চার করেন। এ তত্ত্বটি ছাড়া কোন আয়াত বা হাদীস থেকে এরকম প্রমাণ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব যে, উযেয়র (আ.) পুনরায় জীবিত হয়েও মৃত্যুবরণ করেছেন। অতএব, এতে করে স্পষ্টত প্রমাণিত হয় যে, উযায়র (আ.)-এর পুনর্জীবন জাগতিক ও দৈহিক জীবন ছিল না। নচেৎ এরপর অবশ্যই কোথাও তাঁর মৃত্যুর উল্লেখও বিদ্যমান থাকতো। আর তেমনি, কুরআন করীমে অন্য কারও পুনরায় জীবিত হওয়ার কথা লেখা থাকলে সেটিও জাগতিক দৈহিক জীবন নয়। অতঃপর, পবিত্র হাদীসসমূহে দৃষ্টিপাতে স্পষ্টত প্রতীয়মান হবে যে, আখেরী যুগে ইবনে-মরিয়ম ঈসা অবতীর্ণ (তথা আবির্ভূত) হবেন যাঁর পরিচিতিস্বরূপ সবিস্তারে লেখা আছে যে তিনি গধূম বর্ণের হবেন, তাঁর মাথার চুল (কোকড়ানো না হয়ে বরং) সোজা-সরল হবে; তিনি মুসলমান বলে আখ্যায়িত হবেন এবং মুসলমানদের মাঝে বিরাজমান বিভেদসমূহ দূরীভূত করার উদ্দেশ্যে আগমন করবেন, আর শরীয়তের সারবস্তু যা তারা বিস্মৃত হয়ে থাকবে তিনি তাদের তা মনে করাবেন (হৃদয়ঙ্গম করাবেন) এবং আবশ্যকীয় ভাবে তাঁর আবির্ভাব সেই সময় হবে যখন নৈরাজ্য ও ফেৎনা-ফাসাদ চরম পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াবে এবং মুসলমানদের ওপর সেই অবনতি ও অধঃপতনের যুগ আসবে যা ইহুদীদের ওপর তাদের ধর্মীয় অধঃপতনের শেষ দিনগুলোতে এসেছিল।

অধুনাকালের কতক নবশিক্ষিত মুসলমান ইবনে-মরিয়ম নামে কোন মহাপুরুষের আগমন সম্পর্কেই সন্দিহান। তারা বলেন, যে মহামর্যাদাবান ব্যক্তির সম্পর্কে হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছে সত্যিই তার আসার কথা থাকলে কুরআন করীমে তাঁর সম্পর্কে কিছু উল্লেখ থাকতো, যেমন কিনা 'দাব্বাতুল আর্‌য', 'দুখান' ও ইয়াজুজ-মাজুজের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু আমি বলছি, এই সকল লোক নীরেট ভুলে নিঃপতিত। খোদা তা'লা বিশদ 'কাশ্‌ফ' যোগে এ অধমের প্রতি সুপ্রকাশিত করেছেন যে কুরআন করীমে রূপকাবৃতাকারে প্রতিশ্রুত ইবনে-মরিয়মের আগমনের অবশ্যই উল্লেখ রয়েছে। আর সেটি এভাবে বিদ্যমান যে, খোদা তা'লা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে মূসা (আ.)-এর মসীল বা সদৃশ বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন, তিনি বলেনঃ **'ইন্না আরসালনা ইলাইকুম রাসূলান শাহিদান আলাইকুম কামা আরসালনা ইলা ফিরআউনা রসূলা'** *[(সূরা মুয্‌যাম্মিল : ১৬), অর্থ: 'নিশ্চয় আমরা তোমাদের প্রতি তত্ত্বাবধায়করূপে এক রসূল পাঠিয়েছি যেরূপে আমরা ফিরআউনের প্রতি এক রসূল পাঠিয়েছিলাম।' –অনুবাদক)]*। এ আয়াতটিতে খোদা তা'লা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে মূসার (আ.) মত (তাঁর সদৃশ) বলে আখ্যা দিয়েছেন এবং অস্বীকারকারীদেরকে ফেরাউনের মত (তার সদৃশ বলে) সাব্যস্ত করেছেন। অতঃপর, আরেক জায়গায় বলেনঃ

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ
مِنْ قَبْلِهِمْ ۪ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي
ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ
خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔا ؕ
وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ

(সূরাতুন্ নূর ঃ ৫৬)। অর্থাৎ, খোদা তা'লা এই উম্মতের মু'মিন ও সৎকর্মশীলদের এ

প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তাদের তিনি পৃথিবীতে খলীফা বানাবেন, যেরূপে তিনি পূর্ববর্তীদের (খলীফা) বানিয়েছিলেন অর্থাৎ সে-একই পদ্ধতিতে, একই ধারায় এবং সে একই রকম মেয়াদ ও সময়কালের সদৃশ যুগে এবং একই রকম আকারে যেমনটি ঐশীরীতি ও ব্যবস্থা ইস্রাঈলী জাতির মাঝে বলবৎ ও অতিবাহিত হয়েছিল– এই উম্মতেও সব রকম খলীফা বানানো (বা সৃষ্টি করা) হবে এবং তাদের খেলাফতের সিলসিলা বা ধারাবাহিক শৃঙ্খল পূর্ববর্তীগুলোর চেয়ে কম হবে না– যা বনী ইস্রাঈলের খলীফাগণের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল এবং তাদের খিলাফত-পদ্ধতিও সেই খিলাফত-পদ্ধতির বিরোধী ও ভিন্নতর হবে না যা বনী ইস্রাঈলে খলীফাগণের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। অতঃপর, আরও বলা হয়েছে যে, উল্লেখিত খলীফাগণের মাধ্যমে দীনকে পৃথিবীতে সুপ্রতিষ্ঠা দান করা হবে এবং খোদা তা'লা তাদের ওপর ভয়-ভীতির দিনগুলোর পর শান্তি ও সংহতির দিনকাল আনয়ন করবেন। তারা ঐকান্তিকভাবে একমাত্র তাঁরই ইবাদত-বন্দেগী ও আনুগত্য করবে। তারা কোনো কিছুকে তাঁর শরীক সাব্যস্ত করবে না। কিন্তু ঐ যুগের পর পুনরায় কুফর ছড়িয়ে পড়বে।

পরিপূর্ণ সাদৃশ্যের যে ইঙ্গিৎ **'কামাস্তাখ্‌লাফাল্‌লাযীনা মিন্ কাবলিহিম'** –আয়াতের বাক্যাংশ থেকে বুঝা যায় সেটি প্রমাণ করছে যে, উল্লিখিত এই সাদৃশ্য খিলাফতকালের পরিধি ও পরিসর এবং খলীফাগণের সংস্কার-রীতি ও ব্যবস্থা-পদ্ধতি এবং বিকাশ ও প্রকাশ-ভঙ্গীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। অতএব, এটি সুবিদিত যে, বনী ইস্রাঈলের মাঝে 'খলীফাতুল্লাহ্' হওয়ার পদমর্যাদা হযরত মূসা (আ.) থেকে শুরু হয় এবং একদীর্ঘাকাল যাবৎ পালাক্রমে ইস্রাঈলী নবীগণের মাঝে চলমান থাকার অবস্থায় পরিশেষে চৌদ্দশ' বছর পুরা হওয়ার পর মরিয়মপুত্র হযরত ঈসার ওপর উক্ত চলমান ধারাটি সমাপ্ত হয়। হযরত ঈসা-ইবনে-মরিয়ম এরূপ 'খলীফাতুল্লাহ্' ছিলেন যে, বাহ্যিক (জাগতিক) শাসনের বাগডোর তাঁর হাতে আসে নি ও রাজ্য শাসন বা রাজনীতির সঙ্গে তাঁর কোনো সংশ্রব ছিল না এবং দুনিয়ার কোনো অস্ত্র-সস্ত্র তিনি কখনও কাজে লাগান নি, ব্যবহার করেন নি। কিন্তু সেই হাতিয়ার ব্যবহার করতেন এবং তার দ্বারা সদা তিনি কাজ করতেন, যা তাঁর পবিত্র নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে ও তাঁর মুখনিঃসৃত সদোপদেশে নিহিত ছিল। এর মাধ্যমে তিনি মৃতহৃদয় লোকদের জীবিত করতেন, বধিরদের শ্রবণশক্তি দান করতেন ও জন্মগত অন্ধদের দৃষ্টিশক্তি প্রদানে সত্যের আলো দেখিয়ে দিতেন। বস্তুত তাঁর রূহানী ফুৎকারে বদ্ধমুল অবিশ্বাসীদের মৃত্যু ঘটাতেন ও তাদের ওপর হুজ্জত পূর্ণ করতেন। কিন্তু মু'মিন-বিশ্বাসীদের জীবন দান করতেন। তিনি পিতা ব্যতিরেকে জন্মলাভ করেছিলেন এবং জাগতিক উপায়-উপকরণে তিনি রিক্ত হস্ত ছিলেন। প্রত্যেক ব্যাপারে খোদা তা'লা তাঁর সহায়ক ও অভিভাবক ছিলেন। তিনি ঐ সময় এসেছিলেন যখন ইহুদীরা কেবল দ্বীন-ধর্মকেই নয়, বরং 'ইনসানিয়াত' বা মানবতার মহৎ গুণাবলীকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়েছিল। নির্দয়তা, স্বার্থপরতা, হিংসা-বিদ্বেষ, জুলুম-অত্যাচার, সহিংসতা ও কুপ্ররোচনাকারী আত্মার অন্যায় অযথা উত্তেজনা ও জিঘাংসার মাত্রা তাদের মাঝে অনেক বেড়ে গিয়েছিল এবং মানবজাতির প্রাপ্য হক্-অধিকার রক্ষা ও প্রতিপালনে তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল– কেবল তাই নয়, বরং চরম দুর্ভাগ্যবশতঃ মহান সৃষ্টিকর্তা ও প্রকৃত কল্যাণকারী আল্লাহ্ তা'লার খাঁটি উপাসনা ও আনুগত্যের সম্পর্ক-বন্ধনটিও ছিন্ন করে বসেছিল। কেবল অন্তঃসারশূন্য হাড়-গোড়ের মতো তৌরাতের কতগুলো শব্দ তাদের কণ্ঠস্থ ছিল। ঐশী কহর ও অভিশাপের দরুন এগুলোর প্রকৃত মর্ম ও মূলতত্ত্বে তারা পৌঁছুতে পারতো না। কেননা ঈমান প্রসূত সুক্ষ্মদর্শিতা ও বিচক্ষণতা তাদের ধরা-ছোঁয়ার একেবারে ঊর্ধে উঠেছিল এবং তাদের তমাসাচ্ছন্ন আত্মায় অজ্ঞতা ছেয়ে পড়েছিল। হীন ধূর্ততা ও ঘৃণ্য কার্যকলাপ তাদের মাধ্যমে সংঘটিত হতো এবং মিথ্যাচার, লোক দেখানো সঠতা কপটতা ও বিশ্বাসঘাতকতা তাদের মাঝে চরম পর্যায়ে উঠেছিল। এ রকম সময়ে তাদের প্রতি হযরত মসীহ্ ইবনে-মরিয়ম প্রেরিত হয়েছিলেন। যিনি বনী ইস্রাঈলের মসীহ্ ও খলীফাগণের আখেরী মসীহ্ ও তাদের আখেরী 'খলীফাতুল্লাহ্' ছিলেন। যিনি অধিকাংশ (ইস্রাঈলী) নবীর 'সুন্নত' বা রীতির বিপরীতে বিনা অস্ত্রে (নিরস্ত্রবাদী আদর্শধারীরূপে) এসেছিলেন। স্মরণ রাখা আবশ্যক, মূসীয় শরীয়তে 'খলীফাতুল্লাহ্' (-আল্লাহ্ প্রেরিত নবী)-কে 'মসীহ্' বলা হতো। হযরত দাউদের সময়ে বা তাঁর থেকে কিছুকাল পূর্বে এ শব্দটি বানী-ইস্রাঈলের মাঝে বিস্তার লাভ করে। অন্য কথায়, যদিও বনী-ইস্রাঈলের মধ্যে বেশকিছু নবী এসেছেন। কিন্তু তাদের সবার শেষে আগত হযরত মসীহ্ হলেন সেই নবী যাঁর নাম কুরআন করীমে 'মসীহ্-ইবনে-মরিয়ম' বর্ণিত হয়েছে। বনি-ইস্রাঈলের মাঝে 'মরিয়ম'ও কয়েকজন হয়েছেন এবং তাদের পুত্রও কয়েকজন ছিল। কিন্তু 'মসীহ্-ঈসা-ইবনে-মরিয়ম'– এই তিন নামের সমন্বয়ে বিন্যস্ত একটি নাম বনি ইস্রাঈলের মাঝে আর কারও খুঁজে পাওয়া যায় না। অতএব মসীহ্-ঈসা-ইবনে-মরিয়ম ইহুদীদের সেই খারাপ অবস্থায় আগমন করেন যা সবিস্তারে ইতোপূর্বে তুলে ধরা হয়েছে। আমি বর্ণনা করে এসেছি উপরে বর্ণিত আয়াতে-ইস্তিখ্‌লাফে এই উম্মতের জন্য খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতি ছিল যে, তাদের মাঝেও বনি-ইস্রাঈলের পদ্ধতিতে খলীফাগণ পয়দা হবেন। উল্লেখিত পদ্ধতিটিতে দৃষ্টিপাতে আমাদের মানতে হয় যে, এই উম্মতেও আল্লাহ্-প্রেরিত আখেরী খলীফা মসীহ্-ইবনে-মরিয়মের রূপকাবৃত আকারে আগমন অবশ্যম্ভাবী এবং সেই যুগের সদৃশ যুগে তাঁর আসা জরুরী, যখন হযরত মূসার পর চৌদ্দ শতাব্দী বা এর কাছাকাছি সময়ে হযরত ঈসা-ইবনে-মরিয়ম এসেছিলেন। আর তেমনি কোনো প্রকার যুদ্ধাস্ত্র ছাড়া (পরম শান্তিবাদীরূপে) তাঁর আগমন জরুরী ছিল। যেমন কিনা হযরত মসীহ্ সেভাবেই এসেছিলেন। আর তেমনি, সেই রকম লোকদের সংশোধনী ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে তাঁর আগমন জরুরী ছিল, যেমন কিনা হযরত ঈসা সেই যুগের বিকারগ্রস্ত ইহুদীদের সংশোধনার্থে এসেছিলেন।

উপরোল্লেখিত আয়াতে -ইস্তিখলাফে গভীর দৃষ্টিপাতে আমরা এর অভ্যন্তর থেকে এই আওয়াজ শুনতে পাই যে, আবশ্যকীয়ভাবে এই উম্মতের (প্রতিশ্রুত) আখেরী খলীফা

(হিঃ) চৌদ্দ শতাব্দীর মাথায় আবির্ভূত হবেন। তিনি হযরত মসীহ্‌র রূপকাবৃত আকারে (তার প্রতিচ্ছবি হয়ে) আবির্ভূত হবেন এবং যুদ্ধাস্ত্র ব্যতিরেকে (শান্তিপূর্ণ উপায়ে দ্বীন-ইসলামের পুনরুজ্জীবন এবং অন্যান্য সব দ্বীন ও মতবাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে) আবির্ভূত হবেন।

দু'টি সিলসিলা বা ধারাবাহিক শৃঙ্খলের মাঝে বিদ্যমান সাদৃশ্য নিরূপনে আবশ্যকীয় নিয়ম এটাই যে, উভয়ের শুরু ও শেষটাতে ঘনিষ্ঠভাবে সাদৃশ্য বিরাজ করে থাকে। কেননা একটি সুদীর্ঘ পরিসরে বিস্তৃত ধারাবাহিক শৃঙ্খল এবং একটি সুদীর্ঘ মেয়াদকালের মধ্যবর্তী ব্যক্তিবর্গের খুটি-নাটি সার্বিক অবস্থার সন্ধান করা নিষ্ফল ও অযথা প্রয়াসের শামিল। অতএব, কুরআন করীম যখন পরিষ্কার ভাষায় জানিয়েছে যে, 'ইসলামের প্রতিষ্ঠিতব্য খিলাফতে'র ধারা আপন উন্নতি ও অবনতি, উত্থান-পতন, নিজ 'জালালী' ও 'জামালী' অবস্থার দিক দিয়ে ইস্রাঈলী খিলাফত-ধারার সঙ্গে সার্বিকভাবে সমান্তরাল (সমান সমান) পরস্পর সদৃশপূর্ণ হবে, আর পবিত্র কুরআন এ-ও বলে দিয়েছে যে, 'আরবী-উম্মী' মহানবী (সা.) হলেন হযরত মূসার সদৃশ –তিনি (সা.) উল্লিখিত ইসলামী খিলাফত-ধারার 'সিপাহ্ সালার (সর্বাধিনায়ক), বাদশাহ্ ও সম্রাট এবং সম্মান ও মর্যাদার মহতী সিংহাসনে সর্বশ্রেষ্ঠ আরোহণকারী এবং এই সবকিছুর উৎসমূল, আর নিজ রূহানী সন্তানগণের সর্বপ্রধান পূর্বপুরুষ। সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। অনুরূপভাবে, সার্বিক তুলনার দিক দিয়ে এই খিলাফত-ধারার 'খাতাম' হলেন সেই 'মসীহ্-ইবনে-মরিয়ম' যিনি এই (মুহাম্মদীয়) উম্মতের লোকদের মাঝে আমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'লার আদেশক্রমে মসীহী গুণাবলীর রঙে রঙীন এবং ঐশী ফরমান **'জাআল্‌নাকাল্ মসীহাবনা মারইয়ামা'** (অর্থঃ 'আমরা তোমাকে প্রকৃতপক্ষে 'মসীহ্-ইবনে-মরিয়ম' বানিয়ে দিয়েছি') এই ইলহাম অনুসারে তিনি হলেন "প্রতিশ্রুত মসীহ্"। **'ওয়া কানাল্লাহু আলা কুল্লে শাইয়িন ক্বাদীরা'** *[(সূরা আল্ আহযাব ঃ ২৮) অর্থঃ "এবং আল্লাহ্ নিশ্চয় প্রত্যেক বিষয়ে সর্বকালীন সর্বশক্তিমান'– অনুবাদক]*।

আর এই আগমনকারী (মুহাম্মদী মসীহ্)-কে যে 'আহমদ' নামে অভিহিত করা হয়েছে এটিও তাঁর 'মসীল' বা সদৃশ হওয়ার দিকেই ইঙ্গিত। কেননা, মুহাম্মদ (সা.) 'জালালী নাম, এবং 'আহমদ' (সা.) নামটি তাঁর 'জামালী' নাম। আর 'আহমদ' ও 'ঈসা' নিজ জামালী অর্থের দিক দিয়ে দু'জনই এক ও অভিন্ন। এদিকেই **'ওয়া মুবাশ্‌শিরাম্ বি-রাসূলি ই-ইয়াতি মিম্‌বা'দিস্‌মুহু আহমদ'** *[(সুরাতুস্ সাফ্ ঃ ৭), অর্থাৎ 'এবং আমার (তথা ঈসার) পর এক মহান রসূল হবেন, যাঁর নাম আহমদ' (সা.)।' –অনুবাদক]*। কিন্তু আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কেবল আহমদ'ই নন, বরং 'মুহাম্মদ' (সা.)-ও তিনি, অর্থাৎ 'জালাল' ও 'জামাল' উভয় নাম ও গুণের আধার। কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আখেরী যুগে শুধু ঈসা হওয়ার জামালী গুণের আধার 'আহমদ'কে (রূপকার্থে মসীহ্ মাওউদরূপে) পাঠানো হলো। সেই 'হাই ও কাইয়ুম' খোদা যিনি মানুষকে শুধু পশুই নয়, বরং নিকৃষ্ট জীবে পরিণত করতে সক্ষম। যেমন, তিনি বলেছেনঃ **'জাআল্‌না মিন্‌হুমুল্ কিরদাতা ওয়াল্ খানাযীরা'** (অর্থাৎ 'তাদের কতককে তিনি বানর ও শুকরেও পরিণত করতে সক্ষম।') এবং আরও বলেছেন, **'কুনু কিরদাতান খাসেয়ীন'** অর্থাৎ 'তাঁর আদেশক্রমে তোমরা বানরস্বভাব বিশিষ্ট জীবে পরিণত হতে পার'। অতএব তিনি কি একজন মানুষকে রূপকাবৃতাকারে অন্য এক মানুষে পরিণত করতে পারেন না? তিনি বলেনঃ **'ওয়া হুওয়া বে-কুল্লে খাল্‌ক্বিন আলীম'**। **'বালা, ওয়া হুয়াল্ খাল্লাকুল্ আলীম'**। *[(সূরা ইয়াসীন ঃ ৮০-৮২) অর্থাৎ, তিনি সব রকম সৃষ্টির বিষয়ে সর্বজ্ঞ।' 'হ্যা অবশ্যই, তিনি মহাপারদর্শী স্রষ্টা, সর্বজ্ঞ।']*

তদুপরি, যখন ইনসানিয়্যত বা মানবতার মূলতত্ত্ব ও প্রকৃতস্বরূপ নিঃস্ব ও নিশ্চিহ্ন হওয়ার কবলে পড়ার সময়ে এমনই একজন ব্যক্তির আবশ্যকতা ছিল, যার জন্মলাভ কেবলমাত্র ঐশী হস্তক্ষেপে সংঘটিত হত। অতএব আসমানে তখন (ঐশী ভবিষ্যদ্বাণীর দরুন) যাঁর নাম ইবনে-মরিয়ম (ঈসা) রূপে লিপিবদ্ধ রয়েছে, কেনইবা তাকে সৃষ্টি করায় খোদা তা'লার 'সর্বশক্তিমানতা'র পক্ষে বাধ্যতামূলক ভাবে অক্ষম থাকতে হব?! অতএব, খোদা তা'লা কেবল তাঁর অনুগ্রহক্রমে বিনা কোন পার্থিব উসিলায় এই ইবনে-মরিয়ম'কে রূহানী জন্ম ও রূহানী জীবন প্রদান করলেন। যেমন কিনা তিনি নিজে তাকে ইলহামযোগে বলেন, **"আহ্‌ইয়াইনাকা বা'দামা আহ্‌লাকনাল কুরুনা লউলা ওয়া জাআল্‌নাকাল্ মসীহাব্‌না মারইয়ামা"** অর্থাৎ, 'অতএব, আমরা পূর্ববর্তী জনগোষ্ঠীদের বিলোপসাধনের পর তোমাকে সৃষ্টি করি এবং তোমাকে আমরা মসীহ্-ইবনে-মরিয়মরূপে বানাই' অর্থাৎ এরপর যে সাধারণভাবে মাশায়েখ ও আলেম-উলামার মাঝে রূহানী (ভাবে) মৃত্যু ছড়িয়ে পড়ে। ইঞ্জিলেও এদিকেই ইঙ্গিৎ রয়েছে যে, মসীহ্ নক্ষত্ররাজীর পতনের পর আসবেন। *(চলবে)*

ভাষান্তর:
মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অবঃ)

দৃষ্টি আকর্ষণ

এতদ্বারা বাংলাদেশের সকল মজলিসের নাসের ভাইদের দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, **আগামী ১৩, ১৪ ও ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখ মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশের ৪১তম জাতীয় বার্ষিক ইজতেমা ও ১৫ তারিখ সন্ধ্যা হতে ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ৪২তম মজলিসে শূরা** ৪নং বকশী বাজারস্থ ঢাকা দারুত তবলীগ মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ্।

এই মহতী ইজতেমায় সকল নাসের ভাইকে এবং শূরায় সংশ্লিষ্টদেরকে উপরোক্ত দিনগুলিতে উপস্থিত থাকার জন্য বিনীত অনুরোধ করা যাচ্ছে। অনুষ্ঠানদ্বয়ের সার্বিক সফলতার জন্য বন্ধুগণের নিকট খাস দোয়ার আরজ করা হচ্ছে।

বিনয়াবনত-
মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী
কায়েদ উমুমী
মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ।

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ মোতাবেক ২০ তবুক, ১৩৯৮ হিজরী শামসী'র

জুমুআর খুতবা

মহানবী (সা.)-এর সাহাবী (রা.)-'গণের পুণ্যময় স্মৃতিচারণ

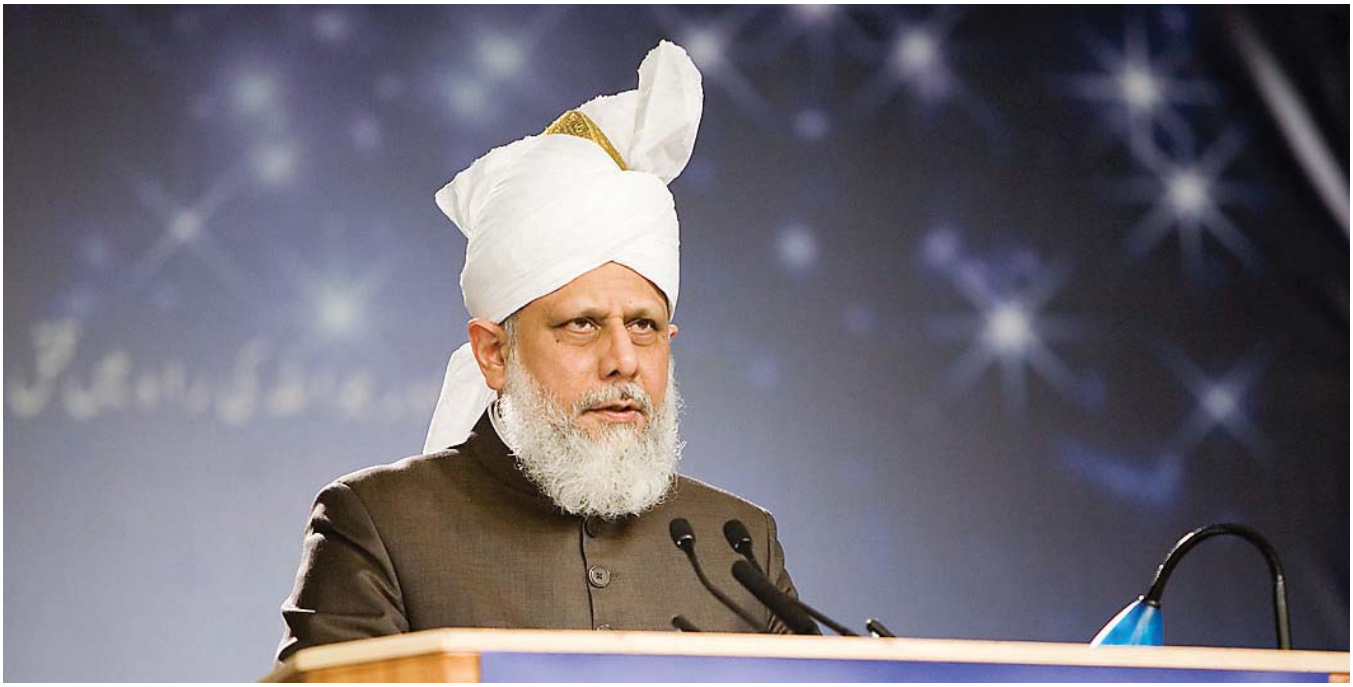

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

বদরী সাহাবীদের স্মৃতিচারণের ধারাবাহিকতায় আজ আমি যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ দিয়ে শুরু করবো তিনি হলেন, হযরত ইয়াযীদ বিন রুকায়েশ (রা.)। হযরত ইয়াযীদ (রা.)-এর সম্পর্ক ছিল কুরাইশ গোত্রের বনু আসাদ বিন খুযায়মা বংশের সাথে এবং হযরত ইয়াযীদ (রা.) বনু আব্দে শামস-এর মিত্র ছিলেন। *(আস সীরাতুন্নাবুবীয়া -ইবনে হিশাম, পৃ. ৪৬০, ২০০১ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)*

কেউ কেউ তার নাম আরবাদও বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এটি সঠিক নয়। *(উসদুল গাবা ফী মা'রেফাতিস সাহাবা -ইবনে আসীর, ৫খণ্ড, পৃ. ৪৫২, ২০০৮ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)*

হযরত ইয়াযীদ (রা.)-এর পিতার নাম ছিল রুকায়েশ বিন রিয়াব এবং তার উপনাম ছিল আবু খালেদ। হযরত ইয়াযীদ (রা.) বদর, উহুদ এবং পরিখাসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। হযরত ইয়াযীদ (রা.) বদরের যুদ্ধে তাঈ গোত্রের আমর বিন সুফিয়ান নামের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন। *(আত তাবাকাতুল কুবরা -ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫০, দার আহইয়াউত তুরাস আল আরাবী ১৯৯৬) (আস সীরাতুন্নবুবীয়া -ইবনে হিশাম, পৃ. ৪৮০, ২০০১ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)*

হযরত ইয়াযীদ (রা.)-এর এক ভাইয়ের নাম ছিল সাঈদ বিন রুকায়েশ (রা.), যিনি নিজ পরিবার পরিজনের সাথে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন, যাদেরকে প্রাথমিক হিজরতকারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। *(উসদুল গাবা ফী মা'রেফাতিস সাহাবা -ইবনে আসীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭৫, সাঈদ বিন রুকায়েশ, ২০০৮ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)*

হযরত ইয়াযীদ (রা.)-এর আরেক ভাইয়ের নাম ছিল হযরত আব্দুর রহমান

বিন রুকায়েশ (রা.), যিনি উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। *(আত তাবাকাতুল কুবরা -ইবনে সা'দ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৭০, ইয়াযীদ বিন রুকায়েশ, দার আহইয়াউত তুরাস আল-আরাবী ১৯৯৬)*

হযরত ইয়াযীদ (রা.)-এর এক বোনের নাম ছিল হযরত আমেনা বিনতে রুকায়েশ (রা.), যিনি প্রাথমিক যুগেই মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন আর তিনিও নিজ পরিবার পরিজনের সাথে মদিনায় হিজরত করেছিলেন। *(আত তাবাকাতুল কুবরা -ইবনে সা'দ ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩৭১, আমেনা বিনতে রুকায়েশ, দার আহইয়াউত তুরাস আল-আরাবী ১৯৯৬)*

হযরত ইয়াযীদ (রা.) ইয়ামামার যুদ্ধের দিন ১২ হিজরী সনে শাহাদত বরণ করেছিলেন। *(আত তাবাকাতুল কুবরা -ইবনে সা'দ, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৫০, ইয়াযীদ বিন রুকায়েশ, দার আহইয়াউল তুরাস আল আরাবী ১৯৯৬)*

এই যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ কিছুটা নিম্নরূপ; অবশ্য পূর্বেও আমি একবার সংক্ষিপ্তভাবে এ বিষয়ে কিছুটা বর্ণনা করেছিলাম।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর খিলাফতকালে ১১ হিজরী সনে ইয়ামামার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, কতিপয় ঐতিহাসিকের মতে ১২ হিজরীতে হয়েছিল। মুসায়লামা কায্যাবের বিরুদ্ধে ইয়ামামা নামক স্থানে এই যুদ্ধ হয়েছিল। হযরত আবু বকর (রা.) হযরত ইকরামা বিন আবু জাহ্‌লের নেতৃত্বে একটি সেনাদল মুসায়লামা কায্যাবের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। তাদের পেছনে তাদের সহযোগিতার জন্য হযরত শোরাহবীল বিন হাসানা (রা.)-এর নেতৃত্বে আরেকটি সেনাদল প্রেরণ করেন। হযরত শোরাহবীলের পৌঁছার পূর্বেই হযরত ইকরামা মুসায়লামা কায্যাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দেন যেন বিজয়-মুকুট তার মাথায় থাকে। কিন্তু মুসায়লামার হাতে তারা পরাজিত হন। হযরত শোরাহবীল যখন এই ঘটনা জানতে পারেন তখন পথিমধ্যেই তিনি থেমে যান। হযরত ইকরামা (রা.) নিজ অবস্থার বৃত্তান্ত হযরত আবু বকর (রা.)-কে লিখে পাঠালে হযরত আবু বকর (রা.) উত্তরে তাকে লিখেন যে, এই অবস্থায় তুমি আমার সাথে সাক্ষাৎ করো না, আর আমি তোমাকে এমন অবস্থায় দেখতেও চাই না, আর তুমি মদিনাতেও ফিরে আসবে না যা দেখে মানুষের মাঝে ভীরুতা সৃষ্টি হতে পারে, বরং তুমি নিজ বাহিনী নিয়ে ওমানবাসী এবং মাহরার বিদ্রোহীদের সাথে গিয়ে যুদ্ধ কর। এরপর ইয়েমেন এবং হাযারা মওতে গিয়ে বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ কর। হযরত আবু বকর (রা.) হযরত শোরাহবীলকে লিখে পাঠান যে, হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদের আগমন পর্যন্ত তুমি স্বস্থানেই অবস্থান কর। হযরত আবু বকর (রা.) হযরত খালেদকে মুসায়লামা কায্যাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করেন এবং তার সাথে আনসার ও মুহাজিরদের একটি বড় বাহিনী প্রেরণ করেন। আনসার দলের নেতা ছিলেন হযরত সাবেত বিন কায়েস (রা.) এবং মুহাজেরদের নেতা ছিলেন হযরত আবু হুযায়ফা ও হযরত যায়েদ বিন খাত্তাব (রা.)। হযরত খালেদের আগমনের পূর্বেই হযরত শোরাহবীল মুসায়লামা কাযযাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দেন এবং পিছপা হয়ে পড়েন। হযরত আবু বকর (রা.) হযরত খালেদের জন্য হযরত সালীত (রা.)-এর নেতৃত্বে আরেকটি অতিরিক্ত বাহিনী প্রেরণ করেন, যেন পেছন থেকে অন্য কেউ তাদের ওপর আক্রমণ করতে না পারে। হযরত আবু বকর (রা.) বলতেন, আমি বদরী সাহাবীদের ব্যবহার করতে চাই না। তারা নিজেদের সৎকর্ম নিয়েই আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে আর এমন অবস্থাতেই আমি তাদেরকে রেখে যেতে চাই। তাদের কাছ থেকে ব্যবহারিক বা প্রত্যক্ষ সাহায্য নিলে যা হতো আল্লাহ্ তা'লা তাদের কল্যাণে এবং পুণ্যবান লোকদের কল্যাণে তার চেয়ে উত্তমরূপে বিপদাবলী দূর করে দেন। যাহোক, কতিপয় বাধ্যবাধকতার কারণে কোন কোন সময় এরা অংশগ্রহণও করেছিলেন। পক্ষান্তরে হযরত উমর (রা.)-এর মতামত এর বিপরীত ছিল। তিনি বদরী সাহাবীদেরকে (রা.) সেনাবাহিনী ইত্যাদিতে কাজে লাগাতেন।

যাহোক, এই যুদ্ধে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিল তের হাজার, অপরদিকে মুসায়লামার সেনা সংখ্যা চল্লিশ হাজার বর্ণনা করা হয়ে থাকে। মুসায়লামা কায্যাবের সাথে এক ব্যক্তি যার নাম ছিল নাহারুর রিজাল বিন উনফুয়া, সে মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে পবিত্র কুরআন এবং ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করে। মহানবী (সা.) তাকে ইয়ামামাবাসীদের জন্য শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করেন, যেন সে মুসায়লামা কায্যাবের নবুয়্যতের দাবির অসারতা প্রমাণ করে। কিন্তু সেখানে গিয়ে এই ব্যক্তি মুরতাদ তথা ধর্মত্যাগী হয়ে যায় আর এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, আমি মহানবী (সা.)-কে এ কথা বলতে শুনেছি, অর্থাৎ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, মুসায়লামাকে আমার সাথে নবুয়তের অংশীদার বানানো হয়েছে, নাঊযুবিল্লাহ। যাহোক, পূর্বেও আর বর্তমানেও যখন কেউ মুরতাদ হয় তখন এভাবেই ভ্রান্ত আপত্তি এবং মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা এমন লোকদের কাজ হয়ে থাকে। যাহোক, মুসায়লামার গোত্র বনু হানিফার ওপর মুসায়লামার নবুয়তের দাবির চেয়ে এই ব্যক্তির ধর্মত্যাগ কয়েকগুণ বেশি মন্দ প্রভাব বিস্তার করেছে। কেননা, তাকে প্রেরণ করা হয়েছিল তরবিয়তের জন্য, তাই মানুষের ওপর তার প্রভাবও ছিল। মুসায়লামার নবুয়তের দাবির ফলে মানুষের মাঝে খুব বেশি প্রভাব পড়ে নি কিন্তু যখন সে ব্যক্তি এসব কথা বলল তখন তার কথায় মানুষ প্রভাবিত হতে আরম্ভ করে। তার সাক্ষ্য সবাই মেনে নেয় এবং ফলাফলস্বরূপ মুসায়লামার আনুগত্য স্বীকার করে নেয় এবং তাকে বলে যে, তুমি নবী (সা.)-কে পত্র লেখ, যদি তিনি তোমার কথা না মানেন তাহলে তাঁর (সা.) বিরুদ্ধে আমরা তোমাকে সাহায্য করব। তাদের পক্ষ

থেকে এই বিদ্রোহের ঘোষণাই মূলত যুদ্ধের প্রকৃত কারণ ছিল।

হযরত আবু বকর (রা.) যে হযরত খালেদ (রা.)-কে প্রেরণ করেছিলেন সেই যুদ্ধের ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে। পরবর্তী ঘটনা এভাবে বিবৃত হয়েছে যে, মুসায়লামা যখন অবগত হলেন, হযরত খালেদ (রা.) কাছাকাছি চলে এসেছে তখন সে উকরাবা নামক স্থানে তার তাঁবু খাটায় আর মানুষকে তার সাহায্যের জন্য আহ্বান করে। বিশাল সংখ্যায় মানুষ তার দিকে আসতে থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মুজ্জাআ বিন মুরারা একটি সেনাদলসহ বাহিরে আসলে মুসলমানরা তাকে এবং তার সাথীদেরকে পাকড়াও করে। যেহেতু তারা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিল, তাই হযরত খালেদ (রা.) তার সাথীদেরকে হত্যা করেন আর মুজ্জাআকে জীবিত রাখেন। এরা সবাই যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিল, যেহেতু বনু হানিফা গোত্রে তার অনেক সম্মান ছিল তাই তাদের নেতাকে হত্যা করেন নি বরং যুদ্ধবন্দি হিসেবে আটক করেন। মুসায়লামার পুত্র শোরাহবীল বনু হানিফাকে উত্তেজিত করতে গিয়ে বলে যে, আজ আত্মাভিমান প্রদর্শনের দিন। অর্থাৎ যখন তাকে (অর্থাৎ মুজ্জাআ'কে) গ্রেফতার করা হয় তখন মুসায়লামার পুত্র বনু হানিফা গোত্রকে প্ররোচিত করতে থাকে যে, আজ যদি তোমরা পরাজিত হও তাহলে তোমাদের মহিলাদেরকে দাসী বানানো হবে আর বিবাহ বহির্ভূতভাবে তাদেরকে ব্যবহার করা হবে। অতএব আজ তোমরা তোমাদের মান-সম্ভ্রমের সুরক্ষার জন্য পূর্ণ বীরত্ব প্রদর্শন কর এবং নিজেদের মহিলাদের সুরক্ষা কর। যাহোক, যুদ্ধ আরম্ভ হয়। মুহাজিরদের পতাকা হুযায়ফার মুক্ত কৃতদাস হযরত সালেম (রা.)-এর কাছে ছিল আর এর পূর্বে তা আব্দুল্লাহ বিন হাফ্স (রা.)-এর কাছে ছিল কিন্তু তিনি শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন, আর আনসারদের পতাকা ছিল হযরত সাবেত বিন কায়েস (রা.)-এর কাছে। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয় আর সেই যুদ্ধ এমন ছিল যে, মুসলমানদের ইতিপূর্বে কখনো এমন ভয়াবহ যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হয় নি। এই যুদ্ধে মুসলমানরা পশ্চাদপদ হয় আর বনু হানিফার লোকেরা মুজ্জাআকে মুক্ত করার জন্য হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.)-এর তাবুর উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়, কেননা তাকে হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.) বন্দি করেছিলেন। সেসময় হযরত খালেদ (রা.)-এর স্ত্রী তাবুর ভিতরে ছিলেন। তারা হযরত খালিদের স্ত্রীকে হত্যা করতে চাইলে মুজ্জাআ বলে, আমি তাকে আশ্রয় দিয়েছি অর্থাৎ তাদেরকে হত্যা করতে বাধা দেয়। মুজ্জাআ তাদেরকে পুরুষদের ওপর আক্রমণ করতে বলে। তখন তারা তাবু কেঁটে চলে যায়। যুদ্ধ আবার চরম আকার ধারণ করে আর বনু হানিফা গোত্রের লোকেরা সবাই মিলে তীব্র আক্রমণ করে। সেদিন কখনো মুসলমানদের পাল্লা ভারী হতো আর কখনো কাফিরদের। সেই যুদ্ধে হযরত সালেম (রা.), হযরত আবু হুযায়ফা (রা.) ও হযরত যায়েদ বিন খাত্তাব (রা.)-এর মতো সম্মানিত সাহাবীরা শহীদ হন।

মুসলমানদের এই অবস্থা যখন হযরত খালেদ (রা.) লক্ষ্য করেন তখন তিনি প্রত্যেক গোত্রকে পৃথক পৃথকভাবে সারিবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দেন, যেন বিপদাপদের মাত্রা অনুমান করা যায় আর এটি বুঝা যায় যে, কোথা থেকে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করা হচ্ছে। অনুরূপভাবে তিনি যুদ্ধের সারিগুলোকে পৃথক পৃথক করে সাজান। মুসলমানরা তখন পরস্পরকে বলছিল যে, আজ পশ্চাদপসরণে আমাদের লজ্জা হচ্ছে, অর্থাৎ আমাদের যে অবস্থা হচ্ছে তা খুবই লজ্জাজনক। মুসলমানদের জন্য এর চেয়ে অধিক বিপদের দিন আর ছিল না। মুসায়লামা তখনো তার অবস্থানে দৃঢ় ছিল এবং কাফিরদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। হযরত খালেদ বুঝতে পারেন এবং অনুভব করেন যে, তাকে হত্যা না করা পর্যন্ত যুদ্ধ বন্ধ হবে না। এটি বুঝতে পেরে হযরত খালেদ (রা.) সামনে এগিয়ে যান এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য আহ্বান করেন। আর রণসঙ্গীত যা সে যুগে ছিল 'ইয়া মুহাম্মদাহ' উচ্চকিত করেন। যে-ই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে সে নিহত হয়েছে, এর ফলে মুসলমানরা উজ্জীবিত হয়। এরপর হযরত খালেদ (রা.) মুসায়লামাকে আহ্বান করেন। কিন্তু সে সামনে আসে নি বরং পলায়ন করে আর নিজ সাথিদের নিয়ে নিজের বাগানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় এবং বাগানের দরজা বন্ধ করে দেয়। মুসলমানেরা চতুর্দিক থেকে সেই বাগান পরিবেষ্টন করে ফলে। হযরত বারা বিন মালেক (রা.) বলেন, হে মুসলমানেরা! তোমরা আমাকে প্রাচীরের ওপর চড়িয়ে ভেতরে নামিয়ে দাও। তিনি খুবই সাহসী পুরুষ ছিলেন। মুসলমানরা বলে, আমরা এমনটি করতে পারি না, কিন্তু হযরত বারা (রা.) তা মানেন নি বরং জোর দিয়ে বলেন, আপনারা আমাকে কোনভাবে এই বাগানের ভেতরে নামিয়ে দিন। কাজেই মুসলমানেরা তাকে প্রাচীরের ওপর চড়িয়ে দেয় আর তিনি তার ওপর থেকে শত্রুদের মাঝে লাফিয়ে পড়ে বাগানের ভেতরে চলে যান। ভেতরে গিয়ে তিনি দরজা খুলে দেন। মুসলমানরা বাগানের ভেতরে প্রবেশ করলে পুনরায় ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। ওয়াহশী মুসায়লামাকে হত্যা করে। এই ওয়াহশী হলো সেই ব্যক্তি যে মহানবী (সা.)-এর চাচা হযরত হামযা (রা.)-কে শহীদ করেছিল। যাহোক, এক বর্ণনামতে, ওয়াহশী এবং অপর এক আনসারী সম্মিলিতভাবে মুসায়লামাকে হত্যা করেছিলেন। ওয়াহশী নিজের বর্শা মুসায়লামার দিকে নিক্ষেপ করেন আর আনসারীও নিজের তরবারি দিয়ে তাকে আঘাত করেন অর্থাৎ উভয়ে একই সময়ে আক্রমণ করেছিলেন। তাই পরবর্তীতে ওয়াহশী বলতেন, আল্লাহ্ই ভালো জানেন যে, আমাদের মধ্যে কার আঘাতে মুসায়লামার ভবলীলা সাঙ্গ হয়। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি চিৎকার করে এই ঘোষণা করে

যে, মুসায়লামাকে এক কৃষ্ণাঙ্গ দাস হত্যা করেছে। তাই এই সম্ভাবনাই বেশি যে, ওয়াহশীই হত্যা করেছে। হযরত খালেদ (রা.) মুজ্জাআ-এর মাধ্যমে মুসায়লামার লাশ খুঁজে বের করেন। মুজ্জাআ হযরত খালেদ (রা.)কে বলেন, মুসলমানদের প্রতিপক্ষ হিসেবে আগত লোকেরা ত্বরাপরায়ণ ও অনভিজ্ঞ ছিল। সকল দুর্গ অভিজ্ঞ সৈনিকে পরিপূর্ণ। তাদের পক্ষ থেকে আমার সাথে সন্ধি করে নিন, এখন যুদ্ধ করলে মুসলমানদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাবে। সে ধূর্ততার সাথে কৌশল অবলম্বন করে। হযরত খালেদ (রা.) এই শর্তে মুজ্জাআ-এর সাথে সন্ধি করেন যে, তাদেরকে প্রাণে মারা হবে না, অর্থাৎ তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে, কিছু করা হবে না, বন্দি বানানো হবে না, এ ছাড়া সকল জিনিসের ওপর মুসলমানরা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে।

মুজ্জাআ অতি চতুর ব্যক্তি ছিল। সে বলে, আমি দুর্গবাসীদের কাছে যাচ্ছি এবং তাদের সাথে পরামর্শ করে আসছি। মুসায়লামা নিহত হওয়ার কারণে তাদের মনোবল ভেঙে পড়েছিল, কিন্তু তার চতুরতা সেই কাফিরদের কাজে লাগে। মুজ্জাআ দুর্গে এসে দেখল, সেখানে মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ এবং দুর্বল ব্যক্তিরা ছাড়া আর কেউই ছিল না। সে এই কৌশল অবলম্বন করে যে, মহিলাদেরকে বর্ম পরিধান করায় আর তাদেরকে বলে যে, আমার ফিরে আসা পর্যন্ত তোমরা গিয়ে দুর্গের প্রাচীরে দাঁড়িয়ে থাক আর অনবরত রণসঙ্গীত উচ্চকিত করতে থাক। হযরত খালেদের কাছে ফিরে এসে সে বলে, তোমার সাথে যে শর্তে আমি সন্ধি করেছিলাম, দুর্গের লোকজন সেটা মানছে না, অর্থাৎ এই শর্ত তারা মানছে না যে, তাদেরকে প্রাণে ছেড়ে দেয়া এবং বাকি সব ধনসম্পদ মুসলমানদের হয়ে যাবে। আর তাদের কেউ কেউ নিজের অস্বীকৃতি প্রকাশার্থে প্রাচীরের উপর দৃশ্যমান রয়েছে; আমি তাদের দায়িত্ব নিতে পারব না, তারা আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। হযরত খালেদ (রা.) দুর্গগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখতে পান যে, সেগুলো সৈন্য-সামন্তে ভরা ছিল। তার অর্থাৎ মুজ্জাআ-র কৌশলের ফলাফলস্বরূপ মহিলারা যুদ্ধের পোশাক পরে সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। এই ভয়াবহ যুদ্ধে মুসলমানদের নিজেদেরও ক্ষতি হয়েছিল, যুদ্ধ অনেক দীর্ঘ হয়ে গিয়েছিল, মুসলমানরা বিজয় অর্জন করে দ্রুত ফিরে যেতে চাইছিল। তাই হযরত খালিদ (রা.) মুজ্জাআ-র সাথে এই শর্তে সন্ধি করেন যে, সব সোনা, রুপা, পশুপাল এবং অর্ধেক দাস-দাসী হযরত খালেদের হাতে তুলে দেয়া হবে। অপর এক বর্ণনানুসারে এক-চতুর্থাংশ বন্দির বিনিময়ে তিনি সন্ধি করেন।

এই যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষ থেকে মদিনার মুহাজির ও আনসারদের মাঝ থেকে তিনশ' ষাটজন এবং মদিনার বাইরের তিনশ'জন মুহাজির শহীদ হন; অপরদিকে বনু হানিফার মধ্য থেকে আকরাবার যুদ্ধ ক্ষেত্রে সাত হাজার, বাগানে সাত হাজার এবং পলাতকদের পিছু ধাওয়ার সময় আরও সাত হাজার কাফিরকে হত্যা করা হয়। এই বাহিনী যখন মদিনায় ফিরে আসে তখন হযরত উমর (রা.) তার পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.)-কে বলেন, যায়েদের পূর্বে তুমি কেন শহীদ হলে না? যায়েদ (রা.) শহীদ হয়ে গেছেন, অথচ তুমি এখনও বেঁচে আছ! কেন তুমি আমার কাছ থেকে তোমার মুখ লুকালে না? একথা শুনে হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.) নিবেদন করেন যে, হযরত যায়েদ (রা.) আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে শাহাদত লাভের প্রার্থনা করেছিলেন এবং আল্লাহ্ তা'লা তাকে তা দান করেছেন; আর আমিও এটি লাভ করার জন্য চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু তা আমার ভাগ্যে জোটে নি। যাহোক, সে বছরই ইয়ামামার যুদ্ধে বহু সংখ্যক সাহাবীর শাহাদতের পর হযরত আবু বকর (রা.) কুরআন সংকলনের নির্দেশ প্রদান করেন; পাছে কুরআন করীম বিলুপ্ত হয়ে না যায়। অতঃপর তা একত্রিত করা হয়। এ ছিল ইয়ামামার যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ। *(আল কামেল ফিত্-তারীখ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৮-২২৩, ১১তম বছর, যিকরু মুসায়লামা ওয়া আহলে ইয়ামামা, ২০০৬ সনে বৈরুতে মুদ্রিত) (তারীখুল তাবারী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০০-৩১০, ২০০২ সনে বৈরুতে মুদ্রিত) (তারীখ ইবনে খলদুন মুতরজম আল্লামা হাকীম আহমদ হুসায়েন ইলা আবাদী, ৩য় খণ্ড, প্রথমাংশ, পৃ. ২৩১, ২০০৩ সনে করাচিতে মুদ্রিত)*

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ করা হবে তাঁর নাম হলো হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাখরামা (রা.)। তার উপনাম ছিল আবু মুহাম্মদ। তার সম্পর্ক ছিল বনু আমের বিন লোঈ গোত্রের সাথে। তাকে আব্দুল্লাহ্ আকবর-ও বলা হতো। তিনি প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। তার পিতার নাম মাখরামা বিন আব্দুল উয্যা এবং মায়ের নাম বাহনানা বিনতে সাফওয়ান ছিল। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাখরামা (রা.)-এর সন্তানের মধ্যে এক ছেলে মাসাহেক-এর উল্লেখ পাওয়া যায় যিনি তার স্ত্রী যয়নব বিনতে সুরাকার গর্ভজাত ছিলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাখরামা (রা.) প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি দু'টি হিজরত করার সৌভাগ্য লাভ করেন, একটি ইথিওপিয়ায় এবং অপরটি মদিনায়। ইবনে ইসহাক হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাখরামা (রা.)-এর উল্লেখ সেসব সাহাবীর মাঝে করেছেন যারা হযরত জা'ফর (রা.)-এর সাথে ইথিওপিয়ায় হিজরত করেছিল। ইউনুস বিন বুকায়ের, সালামা এবং বুকাঈ, ইবনে ইসহাকের এই উক্তি উল্লেখ করেছেন যাতে তিনি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাখরামা (রা.)-এর ইথিওপিয়ায় হিজরতের কথা উল্লেখ করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাখরামা (রা.) হিজরত করে যখন মদিনায় পৌঁছেন তখন তিনি হযরত কুলসুম বিন হিদম (রা.)-এর ঘরে অবস্থান করেন। মহানবী (সা.) হযরত ফারওয়া বিন আমর আনসারীর সাথে

আব্দুল্লাহ্ বিন মাখরামার ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাখরামা বদরের যুদ্ধ এবং পরবর্তী সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাখরামা (রা.) যখন বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তখন তার বয়স ছিল ত্রিশ বছর। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর খিলাফতকালে যখন তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন তখন তার বয়স ছিল ৪১ বছর। *(আত তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০৮-৩০৯, ১৯৯০ সনে বৈরুতে মুদ্রিত) (উসদুল গাবা ফী মা'রেফাতিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৮৩৭৭, ২০০৮ সনে লেবাননে মুদ্রিত)*

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাখরামা (রা.)-র শাহাদত লাভের আকাঙ্ক্ষা অনেক বেশি ছিল। অতএব তিনি আল্লাহ্ তা'লার নিকট এই বলে দোয়া করতেন যে, হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ আমি আমার শরীরের প্রতিটি সন্ধিস্থলে খোদার পথে প্রাপ্ত ক্ষত দেখতে না পাই। অতএব, ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি তার শরীরের সন্ধিস্থলে আঘাত পান, যার ফলে তিনি শহীদ হন। *(আল ইসাবাহ ফী তামযীযিস সাহাবা-ইবনে হাজার আসকালানী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৯৩, ২০০১ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)*

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাখরামা (রা.) অনেক বেশি ইবাদাতগুযার মানুষ ছিলেন আর যৌবনকালেও অনেক বেশি ইবাদত করতেন। হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন যে, ইয়ামামার যুদ্ধের বছর আমি, হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাখরামা (রা.) এবং হযরত আবু হুযায়ফা (রা.)-এর মুক্ত দাস হযরত সালেম (রা.) একসাথে ছিলাম। আমরা তিনজন পালাকরে ছাগল চরাতাম। অর্থাৎ কিছু মালামালও ছিল সৈন্যদের জন্য যার রক্ষণাবেক্ষণ করতে হতো। অতএব যেদিন যুদ্ধ আরম্ভ হয় সেদিন ছাগল চরানোর পালা আমার ছিল। ছাগল চরিয়ে ফিরে আসলে আমি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাখরামা (রা.)-কে যুদ্ধের ময়দানে আহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখি এবং তার কাছে রয়ে যাই। তিনি বলেন, হে আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.)! রোযাদারগণ কি ইফতারী করেছে? সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বলেন, এই ঢালে কিছুটা পানি দাও যেন আমি তা দিয়ে ইফতার করতে পারি। তিনি যুদ্ধাবস্থায়ও রোযা রেখেছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) বলেন, আমি পানি আনতে যাই কিন্তু ফিরে এসে দেখি তিনি ইন্তেকাল করেছেন। *(উসদুল গাবা ফী মা'রেফাতিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৭, আব্দুল্লাহ বিন মাখরামা, বৈরুতে মুদ্রিত) (সীরাতুস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৭০, হযরত আব্দুল্লাহ মাখরামা, করাচি হতে মুদ্রিত)*

পরবর্তী সাহাবী যার স্মৃতিচারণ আমি এখন করব তিনি হলেন হযরত আমর বিন মা'বাদ (রা.)। তার নাম হযরত উমায়ের বিন মা'বাদ (রা.)-ও বলা হয়ে থাকে। তার পিতার নাম ছিল মা'বাদ বিন আযআর। তাঁর সম্পর্ক ছিল আনসারদের অওস গোত্রের বনু যুবাইয়া শাখার সাথে। (আস-সীরাতুন্নবুবীয়া -ইবনে হিশাম, পৃ. ৪৬৫, ২০০১ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)

হযরত আমর বিন মা'বাদ (রা.) বদর, উহুদ, পরিখাসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। হযরত আমর বিন মা'বাদ হুনায়নের যুদ্ধের দিন সেই একশত অবিচল সাহসী যোদ্ধা সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাদের রিযিকের দায়ভার স্বয়ং আল্লাহ্ গ্রহণ করেছিলেন। (আত তাবাকাতুল কুবরা, লেইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৩, ২০১২ সনে বৈরুতে মুদ্রিত) মহানবী (সা.)-এর সাথে তারা অবিচলভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন। এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বলেন, হুনায়নের যুদ্ধের দিন আমাদের অবস্থা এমন ছিল যে, মুসলমানদের দু'টি দল পিছপা হয়ে গিয়েছিল এবং মহানবী (সা.)-এর সাথে একশত লোকও ছিল না। *(সুনান আত-তিরমিযী, আবুওয়াবুল জিহাদ ওয়াস্ সিয়ার, হাদীস নম্বর ১৬৮৯)*

হুনায়নের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর পাশে দৃঢ়তার সাথে অবস্থানকারী সাহাবীগণের সংখ্যার ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। এদের মতে, এমন সাহাবীদের সংখ্যা আশি এবং একশ'র মাঝামাঝি ছিল। *(সুবুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৪, ১৯৯২ সনে কায়রো হতে মুদ্রিত)*

কারো কারো মতে সাহাবীদের সংখ্যা একশত ছিল। যাহোক, তারা অতি স্বল্পসংখ্যক ছিলেন।

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ এখন আমি করব তার নাম হযরত নোমান বিন মালেক (রা.)। তাঁর নাম নোমান বিন কাওকালও বলা হয়ে থাকে। ইমাম বুখারী তার নাম ইবনে কাওকাল বর্ণনা করেছেন। আল্লামা বদরুদ্দীন আয়নী, যিনি একজন আলেম ছিলেন, তিনি বুখারীর ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে, ইবনে কাওকালের পূর্ণ নাম ছিল নোমান বিন মালেক বিন সালেবা বিন আসরাম। সালেবা অথবা আসরামের উপাধি ছিল কাওকাব। নোমান তার দাদার প্রতি আরোপিত হতেন। তাই তাকে নোমান বিন কাউকাল বলা হতো। *(সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস্ সিয়ার, হাদীস নং ২৮২৭) (উমদাতুল ক্বারী, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১৮২-১৮৩, কিতাবুল জিহাদ, ২০০৩ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)*

হযরত নোমান বিন মালেক (রা.) খুঁড়িয়ে হাঁটতেন। *(মা'রেফাতুস সাহাবা -আবু নঈম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩১৭, ২০০২ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)*

হযরত নো'মান বিন মালেক (রা.)-এর পিতার নাম ছিল মালেক বিন সা'লাবা এবং তার মাতার নাম ছিল আমরা বিনতে যিয়াদ। তিনি হযরত মুজায্যান বিনতে যিয়াদের বোন ছিলেন। হযরত নো'মান (রা.)-এর সম্পর্ক ছিল আনসারদের খাযরাজ গোত্রের বনু গানাম শাখার সাথে। এই গোত্র কাওকাল নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ইবনে হিশামের মতে হযরত নোমান বিন মালেক নোমান কাওকাল নামেও সুপরিচিত ছিলেন। এছাড়া ইবনে হিশাম তার গোত্র বনু দাদও উল্লেখ করেছেন। কাউকাল কেন বলা হতো- পূর্বেও একটি খুতবায় তা বর্ণনা করেছি। মদিনায় যখন কোন সর্দারের কাছে কোন ব্যক্তি আশ্রয়

প্রার্থনা করত, তখন তাকে বলা হতো, এই পাহাড়ে যেভাবে চাও আরোহন কর। অর্থাৎ তুমি এখন নিরাপদ, যেভাবে চাও থাক এবং তোমার কোন বিষয়ে কষ্ট অনুভব করার প্রয়োজন নেই, স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব কর আর কোন কিছুকে ভয় করো না। অপর দিকে যারা আশ্রয়দানকারী ছিল তারা কাওয়াকিলা নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ঐতিহাসিক ইবনে হিশাম বলেন, এমন নেতারা যখন কাউকে আশ্রয় দিত তখন তার হাতে একটি তীর দিয়ে বলতো, এখন তুমি এই তীর নিয়ে যেখানে ইচ্ছে যাও। হযরত নো'মানের দাদা সা'লাবা বিন দাদকে কাওকাল বলা হতো। তিনি আশ্রয়দানকারীদের একজন ছিলেন। অনুরূপভাবে খাযরাজ গোত্রের নেতা গানাম বিন অউফকেও কাওকাল বলা হতো, একইভাবে হযরত সাদ বিন উবাদাও কাওকাল উপাধিতে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। এছাড়া বনু সালেম, বনু গানাম এবং বনু অউফ বিন খাযরাজকেও কাওয়াকিলা বলা হতো। বনু অউফ এর নেতা ছিলেন হযরত উবাদা বিন সামেত।

হযরত নোমান বিন মালেক (রা.) বদর এবং উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন আর উহুদের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। তাকে সাফওয়ান বিন উমাইয়্যা শহীদ করেছিল। অপর এক রেওয়ায়েত অনুসারে, হযরত নো'মান বিন মালেককে আবান বিন সাঈদ শহীদ করেছিল। হযরত নো'মান বিন মালেক (রা.), হযরত মুজায্যার বিন যিয়াদ এবং হযরত উবাদা বিন হিসহাসকে উহুদের যুদ্ধের সময় একই কবরে সমাহিত করা হয়েছিল। *(আত তাবাকাতুল কুবরা -ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪১৪, নু'মান বিন মালেক, ২০১২ সনে বৈরুতে মুদ্রিত) (উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫৮-১৫৯, ২০০৮ সনে বৈরুতে মুদ্রিত) (আস সীরাতুন্নাবুবীয়া -ইবনে হিশাম, পৃ. ৫৬০, ২০০১ সনে বৈরুতে মুদ্রিত) (উমদাতুল কারী, ১৪তম খণ্ড, পৃ. ১৮২, ২০০৩ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)*

মহানবী (সা.)-এর উহুদের যুদ্ধের জন্য বের হওয়ার সময় আর আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই সলুলের সাথে পরামর্শের সময় হযরত নোমান বিন মালেক নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! খোদার কসম, আমি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করব। তিনি (সা.) বলেন, তা কীভাবে? তখন হযরত নোমান (রা.) নিবেদন করেন, এই কারণে যে, আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং আপনি (সা.) আল্লাহ্‌র রসূল আর আমি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কখানোই পলায়ন করব না। এতে মহানবী (সা.) বলেন, তুমি সত্য বলেছ। আর সেদিনই তিনি শাহাদত বরণ করেন। *(উসদুল গাবা ফী মা'রেফাতিস সাহাবা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩২২, ২০০৮ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)*

খালেদ বিন আবু মালেক জা'দী বর্ণনা করেন, আমি আমার পিতার গ্রন্থে এই রেওয়ায়েত পেয়েছি যে, হযরত নোমান বিন কাওকাল আনসারী (রা.) দোয়া করেছিলেন, হে আমার প্রভু! তোমার কসম, সূর্যাস্তের পূর্বেই আমি আমার এই পঙ্গুত্ব নিয়ে জান্নাতের শ্যামল উদ্যানে বিচরণ করব। অতএব সেদিনই তিনি শহীদ হন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, আল্লাহ তা'লা তাঁর দোয়া কবুল করেছেন, কেননা আমি তাকে দেখেছি, (অর্থাৎ কাশফে আল্লাহ তা'লা মহানবী (সা.)-কে অবহিত করেন) সে জান্নাতে বিচরণ করছিল এবং তার মধ্যে কোন প্রকার পঙ্গুত্ব ও খোঁড়ামি ছিল না। *(মা'রেফাতুস সাহাবা -আবি নঈম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩১৭, ২০০২ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)*

হযরত আবু হুরায়রা বর্ণনা করেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর নিকট উপস্থিত হই। তিনি (সা.) তখন খায়বারে অবস্থান করছিলেন, আর সাহাবীগণ ইতোমধ্যে তা জয় করেছিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাকেও (মালে গনিমতের) অংশ দিন। তখন সাঈদ বিন আস্-এর এক পুত্র বলে উঠে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! তাকে অংশ দিবেন না। এতে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, সে নোমান বিন কাওকাল এর হত্যাকারী। ইবনে সাঈদ বিন আস্ বলেন, তার আচরণ দেখে আশ্চর্য হতে হয়! সে আমাদের সাথে অহংকারসূচক আচরণ করে। এখনই তো সে 'যান' পাহাড়ের চূড়ায় ছিল, যা তিহামা অঞ্চলে অবস্থিত এবং হযরত আবু হুরায়রার গোত্র দৌস-এর পাহাড়গুলোর মধ্যে একটি পাহাড়, সেখান থেকে ছাগল চরাতে চরাতে সে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে, আবার আমার ওপর অভিযোগ আরোপ করে, আমি একজন মুসলমান পুরুষকে হত্যা করেছি। অতঃপর সে বলে, যাকে আল্লাহ্ তা'লা আমার হাতে সম্মানিত করেছেন এবং আমাকে তার হাতে লাঞ্ছিত করেন নি। অত্যন্ত কৌশলের সাথে সে উত্তর প্রদান করে। সুফিয়ান বলতেন, আমি জানি না, তিনি (সা.) তাকে অংশ দিয়েছিলেন কিনা। *(সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস্ সিয়ার, হাদীস ২৮২৭) (মা'জুমুল বিলদান, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৩)*

হযরত জাবের (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, হযরত নোমান বিন কাওকাল (রা.) রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর নিকটে আসেন এবং তিনি জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি যদি ফরজ নামাযসমূহ আদায় করি ও রমযানের রোযা রাখি এবং হারাম জিনিসকে হারাম আর হালাল জিনিসকে হালাল জ্ঞান করি আর এর চেয়ে অতিরিক্ত কিছুই না করি তাহলে কি আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব? তখন তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ। তখন তিনি বলেন, খোদার কসম! আমি এর বেশি কিছুই করব না। *(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ২৩তম খণ্ড, পৃ. ৭৮)*

হযরত জাবের (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, মহানবী (সা.) জুমুআর খুতবা প্রদান করছিলেন, এমন সময় হযরত নো'মান বিন কাওকাল (রা.) মসজিদে প্রবেশ করলে মহানবী (সা.) তাকে বলেন, হে নো'মান! সংক্ষিপ্তভাবে দুই রাকাত নামায পড়ে নাও। জুমুআর সুন্নত সংক্রান্ত বিষয়ও এখানে বর্ণিত হয়েছে। হযরত নো'মান (রা.) যখন মসজিদে প্রবেশ করেন তখন মহানবী (সা.) জুমুআর খুতবা দিচ্ছিলেন, তিনি (সা.) তাকে বললেন, সংক্ষিপ্তভাবে দুই রাকাত নামায (জুমুআর সুন্নত) পড়ে নাও

খুতবা যেহেতু আরম্ভ হয়ে গেছে তাই দুই রাকাত নামায পড়ে নাও আর সংক্ষিপ্তভাবে পড়। এরপর তিনি (সা.) বলেন, যদি তোমাদের মধ্য থেকে কেউ মসজিদে আসে আর ইমাম খুতবা প্রদানরত থাকেন তাহলে তার উচিত, সে যেন সংক্ষিপ্তভাবে দুই রাকাত নামায পড়ে নেয়। *(মা'রেফাতুস সাহাবা -আবি নঈম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩১৭, ২০০২ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)*

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হযরত খুবায়েব বিন আদী আনসারী (রা.)। হযরত খুবায়েব বিন আদী (রা.) আনসারদের অওস গোত্রের বনু জাহজাবা বিন অওফ বংশের সদস্য ছিলেন। *(উসদুল গাবা ফী মা'রেফাতিস সাহাবা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৮১, খুবায়েব বিন আদী, দারুল ফিকর হতে ২০০৩ সনে মুদ্রিত)*

হযরত উমায়ের বিন আবু ওয়াক্কাস (রা.) যখন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) তার এবং হযরত খুবায়েব বিন আদী (রা.)-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন রচনা করেন। *(উয়ুনুল আসার, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩২, ১৯৯৩ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)*

হযরত খুবায়েব বিন আদী (রা.) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন আর সেই যুদ্ধে তিনি হারেস বিন আমেরকে হত্যা করেছিলেন। বদরের যুদ্ধে মুজাহিদগণের জিনিসপত্রের দেখাশুনার দায়িত্ব তার ওপর ন্যস্ত ছিল। *(সিয়ারুস্ সাহাবা, ৩য় খণ্ড, চথুর্তাংশ, পৃ. ৩০৯, লাহোর)*

হযরত খুবায়েব বিন আদী (রা.) চতুর্থ হিজরী সনে রজী-র অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। হযরত খুবায়েব বিন আদি (রা.) এবং হযরত যায়েদ বিন দাসেনা (রা.)কে মুশরিকরা বন্দি করে এবং তাদেরকে সাথে করে মক্কায় নিয়ে যায়। মক্কায় পৌঁছে এই দু'জন সাহাবীকে বিক্রি করে দেয়া হয়। হারেস বিন আমেরের পুত্ররা হযরত খুবায়েব (রা.)-কে ক্রয় করে যেন তারা তাদের পিতা হারেসকে হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারে; যাকে বদরের যুদ্ধে হযরত খুবায়েব হত্যা করেছিলেন। ইবনে ইসহাকের মতে হুজায়ের বিন আবু ইহাব তামিমী হযরত খুবায়েব (রা.)-কে ক্রয় করেছিল, যে কিনা হারেসের সন্তানদের মিত্র ছিল। তার কাছ থেকে হারেসের পুত্র উকবা হযরত খুবায়েব (রা.)-কে ক্রয় করেছিল যেন নিজ পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারে। একথাও বলা হয়েছে, উকবা বিন হারেস হযরত খুবায়েব (রা.)-কে বনু নাজ্জারের কাছ থেকে ক্রয় করেছিল। একথাও বলা হয়েছে, আবু ইহাব, ইকরামা বিন আবু জাহল, আখনাস বিন শুরায়েক, উবায়দা বিন হাকীম, উমাইয়া বিন আবু উতবা হাযরামীর পুত্ররা এবং সাফওয়ান বিন উমাইয়া একত্রিত হয়ে হযরত খুবায়েবকে ক্রয় করেছিল। এদের পিতৃপুরুষদেরকেই বদরের যুদ্ধে হত্যা করা হয়েছিল। এরা সবাই হযরত খুবায়েব (রা.)-কে ক্রয় করে উকবা বিন হারেসের কাছে সোপর্দ করে যে তাকে নিজ ঘরে বন্দি করে রাখে। *(আল ইসতিয়াব ফী মা'রেফাতিল আসহাব, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩-২৫, খুবায়েব বিন আদী, ২০০২ সনে বৈরুতে মুদ্রিত) (সীরাতে খাতামান্নাবিঈন সা., পৃ. ৫২৩)*

বুখারী শরীফে রজী'র ঘটনা সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ এভাবে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সা.) দশ ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত একটি দল পরিস্থিতির খবরাখবর সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেন। আসেম বিন উমর বিন খাত্তাবের নানা আসেম বিন সাবেত আনসারীকে তাদের আমীর নিযুক্ত করেন। তাঁরা চলে যান এবং উসফান এবং মক্কার মধ্যবর্তী এলাকা বাহ্‌দা নামক স্থানে এসে পৌঁছালে জনৈক ব্যক্তি হুযায়েল গোত্রের একটি অংশ লেহইয়ানকে তাদের সম্বন্ধে জানিয়ে দেয়। এই খবর শোনা মাত্রই বনু লেহইয়ানের প্রায় দু'শ ব্যক্তি বেরিয়ে আসে যাদের সবাই তিরন্দাজ ছিল এবং পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাদের পিছু নেয়। অবশেষে তারা সেই স্থান দেখে ফেলে বা সেখানে পৌঁছে যায় যেখানে তারা খেজুর খেয়েছিলেন। অর্থাৎ সেই দশ ব্যক্তি যেখানে যাত্রাবিরতি দিয়েছিলেন এবং খেজুর খেয়েছিলেন যা মদিনা থেকে পাথেয় হিসেবে তারা নিয়ে এসেছিলেন আর সেখানে বসে তারা সেই খেজুর খেয়েছিলেন এবং সেখানেই খেজুরের আঁটি ফেলে গিয়েছিলেন। তারা সেগুলো দেখে বলে, এগুলো ইয়াসরেব তথা মদিনার খেজুর। অতঃপর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তারা তাদের পিছু নেয়।

আসেম এবং তার সঙ্গীরা যখন তাদের আসতে দেখেন তখন তারা একটি টিলায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। তারা তাদেরকে ঘিরে ফেলে এবং তাদের বলে যে, নীচে নেমে আসো এবং নিজেদেরকে আমাদের কাছে সোপর্দ কর। আমরা তোমাদের সাথে অঙ্গীকার করছি, আমরা তোমাদের কাউকে হত্যা করব না। সেই দলের আমীর আসেম বিন সাবেত বলেন, নিশ্চয় আমি যদি সোপর্দ করি তাহলে আমাকে কাফিরদের প্রদত্ত নিরাপত্তায় টিলা থেকে নামতে হবে আর আমি কাফিরদের প্রদত্ত নিরাপত্তায় টিলা থেকে নামব না। অতঃপর তিনি দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! তুমি তোমার নবীকে আমাদের বিষয়ে অবগত কর। তারা তখন তাদের ওপর তীর বর্ষণ করে এবং আসেমকে সাতজন সহ হত্যা করে। এই দৃশ্য দেখে তিনজন ব্যক্তি কাফিরদের শর্তে রাজি হয়ে, তাদের কথায় বিশ্বাস করে তাদের কাছে নীচে নেমে আসে। তাদের মধ্যে ছিলেন খুবায়েব আনসারি, ইবনে দাসেনা এবং অপর এক ব্যক্তি। তারা যখন নিচে নেমে আসেন তখন কাফিররা তাদেরকে বন্দি করে, তারা তাদের তীরের রশি খুলে এবং তাদেরকে বেঁধে ফেলে। তখন তৃতীয় ব্যক্তি বলে উঠে যে, এটি হলো তোমাদের প্রথম প্রতারণা, খোদার কসম! আমি তোমাদের সাথে যাব না। যারা শহীদ হয়েছেন তাদের মাঝে আমার জন্য এটি এক প্রশান্তিদায়ক দৃষ্টান্ত রয়েছে। আমি এখানেই আছি, শহীদ করতে চাইলে কর। তারা তাকে জোরপূর্বক টানাহ্যাঁচড়া করে যেন তিনি তাদের সাথে যান, কিন্তু তিনি তাতে রাজি হন নি। পরিশেষে তারা তাকে হত্যা করে আর খুবায়েব এবং ইবনে দাসেনাকে বন্দি করে নিয়ে যায় এবং মক্কায়

তাদেরকে বিক্রি করে দেয়। এটি হচ্ছে বদরের যুদ্ধের পরের ঘটনা। হযরত খুবায়েবকে বনু হারেস বিন আমের বিন নওফেল বিন আবদে মানাফ ক্রয় করে। খুবায়েবই হারেস বিন আমেরকে বদরের দিন হত্যা করেছিলেন। খুবায়েব তাদের কাছে বন্দি ছিলেন।

ইবনে শিহাব বলতেন, উবায়দুল্লাহ্ বিন আইয়ায আমাকে বলেন, হারেসের মেয়ে তার কাছে উল্লেখ করেন, যখন তারা তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে অর্থাৎ যারা তাকে ক্রয় করে বন্দি বানিয়েছে তারা এই বিষয়ে একমত হয় যে, এখন তাকে হত্যা করা হবে, শহীদ করা হবে, তখন সেই বন্দি অবস্থাতেই খুবায়েব একদিন তাদের কাছে ব্যবহারের জন্য একটি ক্ষুর চান। এটি খুব বিখ্যাত ঘটনা, যা বর্ণনা করা হয়। অতএব সে ক্ষুর দিয়ে দেয়। হারিসের মেয়ে বলেন, তখন আমার অজান্তে আমার এক বাচ্চা খুবায়েবের কাছে যায় এবং সে তাকে কোলে তুলে নেয়। তিনি বলেন, আমি খুবায়েবকে দেখলাম যে, তিনি বাচ্চাকে তার রানের ওপর বসিয়েছেন আর তার হাতে ক্ষুর রয়েছে। এটি দেখে আমি এতটাই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি যে, খুবায়েব আমার চেহারা দেখে তা বুঝে যান এবং বলেন, তুমি কি এই ভয় পাচ্ছ যে, আমি একে হত্যা করব, আমি এমন কাজ করার মতো লোক নই। হারেসের মেয়ে বলতেন, খোদার কসম! আমি কখনো খুবায়েবের চেয়ে উত্তম বন্দি দেখিনি। তিনি আরো বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি একদিন তার হাতে আঙুরের থোকা দেখেছি যা থেকে তিনি খাচ্ছিলেন, অথচ তিনি তখন শিকলাবদ্ধ ছিলেন এবং মক্কাতে তখন কোন ফলও ছিল না। সে বলতো, এটি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রিযিক ছিল যা তিনি খুবায়েবকে দান করেছিলেন। যখন তাদেরকে হেরেমের বাহিরে নিয়ে যায়, অর্থাৎ এরূপ জায়গায় হত্যা করবে যা হেরেমের অন্তর্ভুক্ত নয়, তখন খুবায়েব তাদের বলেন, আমাকে দুই রাকাত নামায পড়ার অনুমতি দাও। তারা তাকে অনুমতি দেয় আর তিনি দু'রাকাত নামায পড়েন এবং বলেন, আমার এ ধারণা যদি না হতো যে, তোমরা ভাববে আমি এখন যে অবস্থায় নামাযে রয়েছি তা মৃত্যুর ভয়ে, তাহলে আমি অবশ্যই আরো দীর্ঘ নামায পড়তাম। অতঃপর তিনি আপন খোদার সমীপে এই দোয়া করেন, হে আল্লাহ! তাদেরকে এক এক করে ধ্বংস কর। তাকে যখন শহীদ করা হচ্ছিল তখন তিনি এই দোয়াও করেছিলেন, হে আল্লাহ! তাদেরকে এক এক করে ধ্বংস কর। এরপর হযরত খুবায়েব এই পংক্তি পড়েন,

ওয়া লাসতু উবালী হীনা উক্‌তালু মুসলিমা
আলা আইয়্যে শিক্কিন কানা লিল্লাহি
মাসরাঈ
ওয়া যালিকা ফী যাতিল ইলাহি ওয়া ইন
ইয়্যাশা
ইউবারিক আলা আওসালি শিলবিন
মুমায্‌যা'

অর্থাৎ, আমি যেহেতু মুসলমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করছি তাই আমার কোন পরোয়া নেই যে, আল্লাহ্‌র খাতিরে কোন পার্শ্বে পতিত হব। আমার এই পতিত হওয়া আল্লাহ্‌রই জন্য আর তিনি ইচ্ছা করলে টুকরো করা শরীরের প্রতিটি সন্ধিস্থলে বরকত দান করতে পারেন।

বুখারীর ব্যাখ্যাকারী বা ভাষ্যকার আল্লামা হাজর আসকালানী রজী-র যুদ্ধাভিযান সম্পর্কে একটি হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেন যে, হযরত খুবায়েব শাহাদতের সময় এই দোয়া করেন, আল্লাহুম্মা আহ্‌সেহিম আদাদা। অর্থাৎ হে আল্লাহ! এই শত্রুদের সংখ্যা গণনা করে রাখ। আমার এই শত্রুদের গণনা করে রাখ যেন তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পার। অপর এক রেওয়াতে এই শব্দসমূহ অতিরিক্ত আছে যে, ওয়াক্‌তুলহুম বাদাদান ওয়া লা তুবকি মিনহুম আহাদা। অর্থাৎ- তাদেরকে বেছে বেছে হত্যা কর আর তাদের মাঝ থেকে কোন একজনকেও অবশিষ্ট রেখ না। *(বুখারী, কিতাবুল মাগাজি, হাদীস নং ৩০৪৫) (ফাতহুল বারী, সহীহ বুখারী, ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৮)*

যাহোক, হযরত খুবায়েব বিন আদী (রা.) নফল আদায় শেষ করলে হারেসের ছেলে উকবা সেখানে গিয়ে খুবায়েব (রা.)-কে হত্যা করে অর্থাৎ তাকে শহীদ করে। বুখারীর অপর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত খুবায়েবকে আবু সারাআ হত্যা করেছিল। হযরত খুবায়েব (রা.)-ই প্রত্যেক এমন মুসলমানের জন্য দুই রাকাত নফল নামায আদায় করার সুন্নত প্রবর্তন করেছিলেন যাকে এভাবে বেঁধে হত্যা করা হয়।

আসেম বিন সাবেতের শাহাদতের দিনের দোয়া আল্লাহ্ তা'লা কবুল করেছিলেন আর মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের এই সংবাদ জানান। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি দোয়া করেছিলেন আল্লাহ্ তা'লা যেন মহানবী (সা.)-এর নিকট এই সংবাদ পৌঁছিয়ে দেন। তিনি সেই দলের দলনেতা ছিলেন, আর হযরত খুবায়েবও আসেম বিন সাবেতের সাথে সেই দলের সদস্য ছিলেন। মহানবী (সা.) তাদের সাথে যা ঘটেছে এবং তারা যে কষ্ট পেয়েছিলেন স্বীয় সাহাবীদের সে সম্পর্কে অবহিত করেন। যখন কাফির কুরাইশদের কতিপয় লোক অবহিত করে যে, আসেমকে হত্যা করা হয়েছে, তখন তারা আসেমের দিকে কতিপয় ব্যক্তিকে প্রেরণ করে, যেন তারা তার মরদেহ থেকে এমন একটা অংশ নিয়ে আসে যার মাধ্যমে তাকে শনাক্ত করা যায়। বদরের যুদ্ধের দিন হযরত আসেম কুরাইশদের বড় নেতাদের একজনকে হত্যা করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা এমন ব্যবস্থা করেন যে, হযরত আসেমের মরদেহের ওপর এক ঝাঁক মৌমাছি প্রেরণ করেন যা আবরণের ন্যায় মরদেহকে ঢেকে রাখে, যার ফলে কুরাইশদের প্রেরিত লোকেরা তার মরদেহের কোন ক্ষতি করতে পারেনি এবং তাদের কাছ থেকে রক্ষা করেন আর তারা কোন অঙ্গ কর্তন করতে পারে নি। *(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাজী, হাদীস ৪০৮৬-৪০৮৭)*

হযরত খুবায়েব-কে যখন শহীদ করা হয় বা শহীদ করা হচ্ছিল তখন তিনি আল্লাহ্‌র

কাছে এই দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ্, আমার কাছে এমন কোন মাধ্যম নেই যার মাধ্যমে তোমার রসূল (সা.)-এর কাছে আমার সালাম পৌঁছাতে পারি। অতএব তুমিই আমার পক্ষ থেকে মহানবী (সা.) এর কাছে আমার সালাম পৌঁছে দাও। হযরত খুবায়েবকে হত্যা করার জন্য যখন মঞ্চে উঠানো হয় তখন পুনরায় দোয়া করেন। তিনি বলেন, এক মুশরিক যখন এই দোয়া শুনে যে, আল্লাহুম্মা আহ্‌সেহিম আদাদান ওয়াকতুলহুম বাদাদা অর্থাৎ হে আল্লাহ, তুমি কাফিরদের সংখ্যা গণনা করে রাখ আর তাদেরকে বেঁছে বেঁছে হত্যা কর, তখন সে ভয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে। তিনি বলেন, এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই মাটিতে শুয়ে পড়া সেই ব্যক্তি ব্যতিরেকে হযরত খুবায়েবের হত্যায় অংশগ্রহণকারী আর কেউই জীবিত থাকে নি, সবাই ধ্বংস হয়ে যায়। হযরত মুআবিয়া বিন আবু সুফিয়ান বর্ণনা করেন, আমি আমার পিতার সাথে এই ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলাম। আমার পিতা যখন হযরত খুবায়েবের দোয়া শুনলেন তখন তিনি আমাকে মাটিতে শুইয়ে দিতে লাগলেন। উরওয়া বর্ণনা করেন যে, আরো কিছু লোকও থেকে থাকবে। যাহোক, একটি ছিল প্রথম বর্ণনা। আর দ্বিতীয় আরেকটি বর্ণনা রয়েছে তার। পৌত্তলিকদের মধ্যে যারা এ ঘটনায় উপস্থিত ছিল তাদের মাঝে আবু ইহাব, আখনাস বিন শুরায়েক, উবায়দা বিন হাকিম এবং উমাইয়্যা বিন উতবা অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি এটিও বর্ণনা করেন যে, জিবরাঈল মহানবী (সা.) এর সমীপে আসেন আর তাঁকে (সা.) এ ঘটনার সংবাদ প্রদান করেন, যারপর তিনি (সা.) নিজ সাহাবীদেরকে অবহিত করেন। সাহাবীরা বলেন, সে দিন মহানবী (সা.) বসেছিলেন, অর্থাৎ বৈঠক চলছিল; তিনি (সা.) বলেন, ওয়া আলাইকাস্‌সালামু ইয়া খুবায়েব! অর্থাৎ হে খুবায়েব! তোমার ওপর আল্লাহ্‌র শান্তি বর্ষিত হোক। তিনি (সা.) এটিও বলেন যে, কুরাইশরা তাকে হত্যা করেছে। *(ফাতহুল বারী, সহীহ বুখারী, ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৮, হাদীস নম্বর ৪০৮৬)*

অতএব, আল্লাহ্ তা'লা সালাম পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে দেন। সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যায় এটি লেখা রয়েছে।

হযরত খুবায়েব (রা.)কে যখন শহীদ করা হয় তখন মুশরিকরা তার চেহারা কিবলার পরিবর্তে অন্য দিকে ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু সেই মুশরিকরা যখন কিছুক্ষণ পর হযরত খুবায়েবের চেহারা পুনরায় দেখে তখন তা ক্বিবলামুখী ছিল। তারা বারবার হযরত খুবায়েবের চেহারা অন্যদিকে ফিরিয়ে দেয়, কিন্তু এতে সফল হতে পারে নি। অবশেষে মুশরিকরা তাকে এ অবস্থায়ই ছেড়ে দেয়। *(আল-ইসাবাতু ফী তাময়ীযিস্ সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৭, খুবায়েব বিন আদী, ২০০৫ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)*

অপর এক রেওয়ায়েতে এটিও রয়েছে যে, কুরাইশরা খুবায়েবকে একটি গাছের শাখার সাথে ঝুলিয়ে দেয়, এরপর বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে। এ দলে সাঈদ বিন আমের নামের এক ব্যক্তিও ছিল, যে পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে যায়। হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকাল পর্যন্ত তার এ অবস্থা ছিল যে, যখনই খুবায়েবের ঘটনা তার মনে পড়ত সে মূর্ছা যেতো, সে অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল আর পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। *[সীরাত খাতামান্নাবীঈন (সা.), পৃ. ৫১৫-৫১৬]*

তার আরো কিছু ঘটনা এবং উদ্ধৃতি রয়েছে, এগুলো পরবর্তীতে বর্ণনা করা হবে।

এখন আমি প্রথমত এই ঘোষণা করতে চাই যে, তারীখে আহমদীয়াত (আহমদীয়াতের ইতিহাস) বিভাগ তাদের নিজেদের একটি ওয়েব সাইট চালু করেছে। এটি উর্দু ও ইংরেজি দুই ভাষার সমন্বয়ে, যাতে আহমদীয়াতের ইতিহাস ও জীবনচরিত সম্পর্কে জামা'তের প্রকাশিত পুস্তকাদি আপলোড করা হচ্ছে। যেমন- হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), আহমদীয়াতের খলীফাগণ, আসহাবে আহমদ, আহমদীয়াতের শহীদগণ, কাদিয়ানের দরবেশগণ, জামা'তের মুবাল্লিগগণ ও জামা'তের অন্যান্য বুযুর্গদের জীবনী সম্পর্কিত পুস্তকাদি, সন্দর্ভ, প্রবন্ধ, স্মরণীয় বিভিন্ন আলোকচিত্র, তারীখে আহমদীয়াতের যতগুলো খণ্ড এখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে সেসব খণ্ড, অঙ্গসংগঠন, বিভিন্ন দেশ ও শহরের জামা'তী ইতিহাস, জামা'তের বুযুর্গদের বিভিন্ন লেখনী, কতিপয় পবিত্র তাবর্‌রুকের ছবি, পত্রিকা এবং সাময়ীকির মূল্যবান ও দুর্লভ কাটিং ইত্যাদি রয়েছে। গবেষণামূলক ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধ আপলোড করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ জামা'তী অনুষ্ঠান ও জামা'তী ভবন, যেমন: মসজিদ ও মিশন হাউস, কেন্দ্রীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, ডিসপেনসারি, গেস্ট হাউস ইত্যাদির ছবি ও যতদূর সম্ভব সেগুলোর পরিচয় দেয়া হয়েছে। ইউটিউবের একটি ভিডিও চ্যানেলের মাধ্যমে এম.টি.এ-র কিছু দুর্লভ ডকুমেন্টারি ইত্যাদিও দেয়া হয়েছে। এই ওয়েব সাইটে জামা'তে আহমদীয়ার শুরু থেকে আজ পর্যন্ত যেসব গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা রয়েছে সেগুলোর ওপর টাইমলাইনও দেয়া হচ্ছে। আমি জুমআর পর ইনশাআল্লাহ্ এই ওয়েব সাইটটি উদ্বোধন করবো।

দ্বিতীয়ত একটি দুঃখজনক সংবাদ রয়েছে। আমাদের প্রবীণ মুবাল্লিগ সফীউর রহমান খুরশীদ সাহেব পিতা হাকীম হাফিজুর রহমান সানৌরী সাহেব, যিনি আফ্রিকা ও অন্যান্য স্থানেও মুবাল্লেগ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন, পরবর্তীতে নুসরাত আর্ট প্রেসের ম্যানাজার ছিলেন, তিনি গত ১৬ সেপ্টেম্বর ৭৫ বছর বয়সে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ এখন (নামাযের পর) আমি তার গায়েবানা জানাযা পড়াবো।

তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মৌলভী কুদরত উল্লাহ সানৌরী সাহেবের দৌহিত্র ছিলেন। তার পিতাও অর্থাৎ সফীউর রহমান খুরশীদ সাহেবের পিতাও ওয়াকফে যিন্দেগী ছিলেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)'র নির্দেশে তিনি সিন্ধু প্রদেশে জামাতের কৃষি ভূমিতে দায়িত্ব পালন করেন। সফীউর রহমান সাহেবের প্রাথমিক শিক্ষা লাভ হয় রাবওয়াতে। এরপর তার 'মা' একটি স্বপ্ন দেখেন, যার ভিত্তিতে তিনি ১৯৬১ সনে রাবওয়ার জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তি হন এবং ১৯৭০ সনে শাহেদ ডিগ্রী লাভ করেন। তার দু'জন স্ত্রী ছিলেন। প্রথম স্ত্রীর ঘরে তার এক কন্যা রয়েছে কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ থেকে কোন সন্তানাদি নেই। সফীউর রহমান সাহেবের মেয়ে রওশন আরা, যিনি জামীল আহমদ সাহেবের স্ত্রী, তিনি এখানেই (লণ্ডনে) বসবাস করেন। জামেয়া পাশ করার পর সফীউর রহমান সাহেব কিছুকাল রাবওয়ার বিভিন্ন কেন্দ্রীয় অফিসে কাজ করেন, এরপর চকওয়ালে মুরব্বী হিসেবে পদায়িত ছিলেন। আর সেখানে তিনি এক বছর পর্যন্ত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত হাকীম আব্দুল্লাহ্ সাহেবের সাথে থেকে কাজ করার তৌফিক লাভ করেন।

১৯৭২ সনে তাকে সিয়েরালিওন প্রেরণ করা হয়। তিনি বলেন, আফ্রিকার উদ্দেশ্যে যাত্রার সময় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) এই নির্দেশনা প্রদান করেন যে, আফ্রিকানদের ভালোবাসবে। তিনি বলেন, এই উপদেশকে আমি আমার মনমস্তিষ্কে গেঁথে নেই। এরপর তিনি খোদা তা'লার সাহায্য সম্পর্কিত একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। একবার সিয়েরালিওন এর দুর্গম এলাকায় দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে এবং নৌকায় পাড়ি দিয়ে সন্ধ্যায় একটি জনবসতিতে পৌঁছাই আর একজন বয়োবৃদ্ধ আফ্রিকান আহমদীও তার সাথে ছিলেন। সেখানে যখন পৌঁছি তখন গ্রামের চীফ বা গ্রাম্যপ্রধান সেখানে উপস্থিত ছিল না। তাই তাদের যে রীতি-রেওয়াজ রয়েছে, সে মোতাবেক চীফ ইমামের কাছে যাই। চীফ ইমাম আমাদের কথা শুনতে অস্বীকার করে আর গ্রাম থেকে আমাদেরকে বের করে দেয়। রাত ঘনিয়ে আসছিল, কোন নিরাপদ আশ্রয় ছিল না, তাই ফিরতি পথ ধরেন। গ্রামের কিছু দূর যেতেই বনাঞ্চল আরম্ভ হয়ে যেত আর সেটি এমন এলাকা ছিল যেখানে সমুদ্র অথবা নদীর স্রোত বা ঢেউয়ের পানিও এসে যেত। তিনি বলেন, আমরা হাঁটছিলাম আর অনেক উদ্বিগ্ন ছিলাম। এমতাবস্থায় একপাশ থেকে এক ব্যক্তি ডাক দেয়, যে উঁচু স্থানে বসেছিল, এরপর সে আমাদেরকে তার ঝুঁপড়িতে আশ্রয় প্রদান করে। কিছুক্ষণ পর আরো কয়েকজনের ডাকশুনতে পাই, মানুষ আমাদেরকে ডাকছিল আর কাছে আসার পর বলে যে, চীফ ইমাম তোমাদের ফেরত ডেকে পাঠিয়েছে। সে তোমাদের বের করেছে, তোমাদের যাওয়ার পর থেকেই তার প্রচণ্ড মাথাব্যাথা আরম্ভ হয়ে যায়। তখন সে বলে, তাদেরকে ডেকে নিয়ে আসো, সম্ভবত তাদের বের করে দেওয়ার কারণেই মাথা ব্যাথা হচ্ছে। যাহোক, তারা ফিরে যান, সে (অর্থাৎ চীফ ইমাম) পুরো গ্রামবাসীকে সমবেত করে, তিনি বলেন যে, আমরা রাতে সেখানে তবলীগ করি আর দশ-বারোজন আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। চীফ ইমামের মাথা ব্যাথা দূর হওয়ার জন্য আমরা সূরা ফাতিহার দম করি এবং আল্লাহ্‌র কৃপায় সেও আরোগ্য লাভ করে। আর এভাবে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তাদের থাকার ব্যবস্থাও করে দেন; কেবল এটিই নয় বরং কয়েকটি বয়আতও দান করেন।

তিনি সিয়েরালিওনে প্রিন্টিংপ্রেস চালু করারও সুযোগ লাভ করেছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) সেখানে বিশেষ মেশিন প্রেরণ করেন, যা সে যুগে সেখানে স্থাপন করা হয়। প্রথমে সেখানে প্রেস সফল হচ্ছিল না। যাহোক তিনি অত্যন্ত সফলতার সাথে এটিকে পরিচালনা করেন আর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস এই প্রেসের কারণে তার অনেক প্রশংসাও করতেন। এরপর নাইজেরিয়া-য় তার নিযুক্তি হয়। সেখানেও তিনি জামা'তের প্রেস চালু করেন এবং অত্যন্ত সফলতার সাথে তা পরিচালনা করেন বরং সেদিনগুলোতে একটি দুর্ঘটনাও ঘটে। কাজ করার সময় প্রেসের মেশিনে পড়ে তার একটি আঙুল কেটে যায়। প্রচুর চিকিৎসা করান কিন্তু তা ভালো হচ্ছিল না। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) সেই দিনগুলোতে সম্ভবত লন্ডনে ছিলেন। তিনি যখন জানতে পারেন, তিনি তাকে বলেন যে, লন্ডনে এসে চিকিৎসা করাও। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এরপর তা ভালো হয়ে যায়। অতঃপর 'রাকীম প্রেস' যা এখানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ছিল, সেসময় তিনি এখানে ছিলেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)তাকে বলেন, তুমি এখানেও প্রেস স্থাপনের চেষ্টা কর। আর এর জন্য যে কমিটি গঠন করা হয় তাতে মুস্তফা সাবেত সাহেব এবং মুবারক সাকী সাহেবও ছিলেন, তাদের সাথে তিনি তাকেও অন্তর্ভুক্ত করেন। এরপর এখানেও তখন থেকে প্রেস চালু আছে।

আফ্রিকার সিয়েরালিওন এবং নাইজেরিয়ায় তিনি প্রায় ১৭ বছর সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। এরপর ১৯৮৮ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)আফ্রিকা সফরের সময় তাকে বলেন যে, ক্যামেরুন যাও, সেখানে জামা'তের সূচনা কর। বহু কষ্টে তিনি ভিসা পান। তিনি সেখানে যান এবং এক মাস ক্যামেরুনে অবস্থান করেন। সেখানে তবলীগের সুযোগও লাভ হয়। রেডিওতে তার সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়। আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এই সফরের সময় একটি পরিবার বয়আত করার সৌভাগ্যও লাভ করে। ১৯৮৮ সনে তিনি পাকিস্তানে ফিরে আসেন। এরপর লাহোরে মুরব্বী হিসেবে সেবা করার সুযোগ লাভ করেন। এখানেও বিভিন্ন উপলক্ষ্যে জলসায় আসতেন। প্রাইভেট সেক্রেটারী দপ্তরে বিভিন্নভাবে সেবা করেছেন। ১৯৯১ সন থেকে নুসরত আর্ট প্রেসের ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ লাভ করেন। কিছুকাল থেকে স্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়ার কারণে অসুস্থ ছিলেন। তাই অবসর গ্রহণ করেন।

আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি কৃপা এবং মাগফিরাত করুন। তার মর্যাদা উন্নীত করুন। তার এক কন্যা রয়েছে, তাকেও আল্লাহ্ তা'লা ধৈর্য ও মনোবল দান করুন এবং তার স্ত্রীকেও ধৈর্য ও মনোবল দিন।

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১১ অক্টোবর ২০১৯, পৃ. ৫-১০)

Islamic Principles on Education and Serving Humanity

Address by the Worldwide Head of the Ahmadiyya Muslim Community at the UNESCO Headquarters in Paris, France

Introduction: The Worldwide Head of the Ahmadiyya Muslim Community, the Fifth Khalifah (Caliph), His Holiness, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) delivered a historic keynote address on 8th October 2019 at the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organisation (UNESCO) Headquarters in Paris. The event was attended by over 80 dignitaries and guests, including diplomats, politicians, academics and the representatives of think tanks as well as business leaders and various other professions. Before the keynote address, several distinguished speakers took to the stage and spoke of their admiration of the Ahmadiyya Muslim Community and its efforts to propagate Islam's message of peace across the world, as well as its commitment to serving humanity. The guest speakers included: Ambassador Oumar Keïta, Delegate of Mali to UNESCO, Religious Advisor of Foreign Affairs Ministry, Mr Jean Christophe Auge, Director of the Central Religion Advisory Board to the Interior Ministry of France, Mr Clément Rouchouse, Mayor of Eaubonne, Mr Guillaume Dublineau, President of the NATO Memorial, Mr Willy Breton. An introduction to the Ahmadiyya Muslim Community was given by the National External Affairs Secretary of the Ahmadiyya Muslim Community in France, Mr Asif Arif. The official transcript of keynote address delivered by His Holiness, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) on this occasion is presented below.

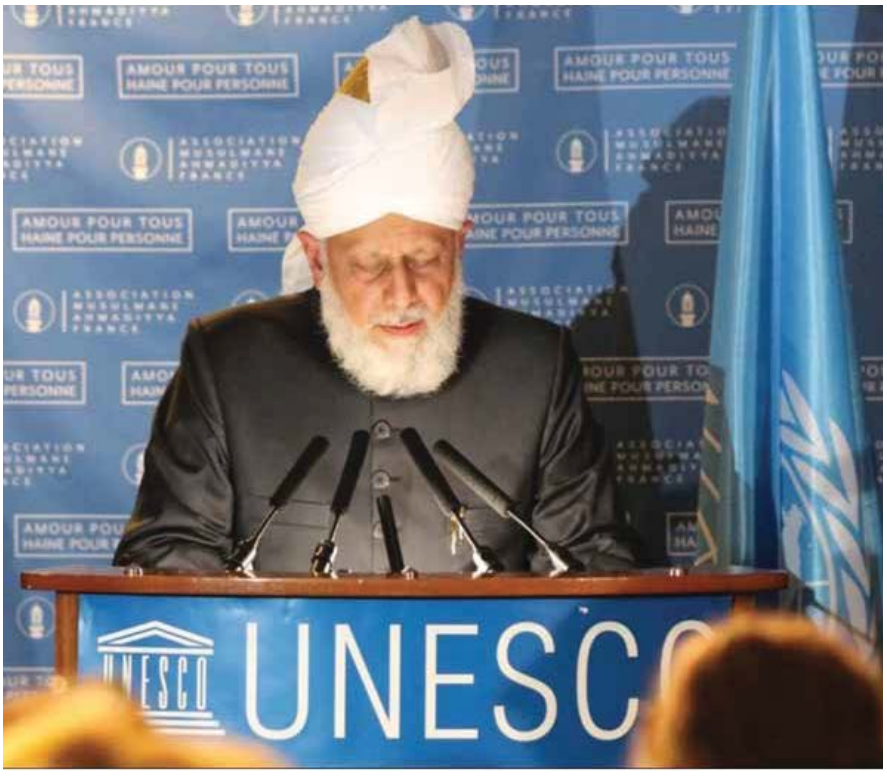

Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba), Worldwide Head of the Ahmadiyya Muslim Community, Fifth Khalifah (Caliph) said: "*Bismillahir Rahmanir Raheem* – in the Name of Allah, the Gracious, Ever Merciful.

All distinguished guests, *Assalamo Alaikum Wa Rahmatullahe Wa Barakatohu* – peace and blessings of Allah be upon you all.

First of all, I would like to take this opportunity to thank the UNESCO administration for graciously permitting us to hold this event today.

I would also like to place on record my sincere gratitude to

all the guests who have accepted our invitation and have come to listen to a person, who is neither a politician, nor a political leader nor a scientist, but rather is the head of a religious community – the Ahmadiyya Muslim Community.

The founding objectives of UNESCO are excellent and praiseworthy. Amongst its objectives are fostering peace and respect, promoting the rule of law, human rights and education across the world.

UNESCO also advocates for press freedom and protecting different cultures and heritages. Another of its stated goals is to eradicate poverty, to promote sustainable global growth and development and to try to ensure that humanity leaves behind a positive legacy, from which future generations can benefit.

You may be surprised to learn that Islamic teachings require Muslims to work towards fulfilling these same objectives and to continually strive for the progress of humanity. Such service is based upon the very first chapter of the Holy Quran, which states that Allah the Almighty is the "Lord of all the worlds."

This verse is central to the Islamic faith, whereby Muslims are taught that God Almighty is not just their Lord and Provider, but He is the Provider and Sustainer of all humankind. He is the Gracious and Merciful and so, irrespective of caste, creed or colour, God Almighty fulfils the needs of His creation. Given this, true Muslims firmly believe that all humans are born equal and that regardless of differences of belief, the values of mutual respect and tolerance must be firmly embedded within society.

A beautiful Islamic principle given in chapter 2, verse 139 of the Holy Quran, is that Muslims should seek to follow the ways of Allah the Almighty and adopt His attributes. As mentioned, Allah's Grace is all-encompassing and He is the Provider and Sustainer for all people, including those who deny His existence. His Grace and Mercy remains even with those who continually speak ill of Him or who conduct cruelties in the world.

In Islam, the philosophy of punishment or sanction established by God Almighty is weighted more towards the hereafter, whilst in this life, Allah the Almighty continues to manifest His Grace and Mercy upon the world. By instructing Muslims to adopt His ways, Allah the Almighty has instructed them to show compassion and sympathy to their fellow creation. In light of this, it is a religious obligation on Muslims to fulfil the requirements of other people, irrespective of religion, culture or ethnicity and to always be kind and empathetic to the emotions and needs of others.

Moreover, the Holy Quran has pronounced that the Holy Prophet of Islam (peace and blessings of Allah be upon him) was sent to the world by God Almighty as a source of unparalleled mercy and benevolence for all humanity. He was the practical manifestation of the compassionate teachings of Islam. After he founded Islam, the Holy Prophet Muhammad (peace and blessings of Allah be upon him) and his followers were subjected to brutal and inhumane treatment by the non-Muslims of Makkah, which they endured with patience and restraint.

Finally, after suffering years of relentless persecution, they migrated to the city of Madinah where the Holy Prophet Muhammad (peace and blessings of Allah be upon him) formed a covenant of peace between the Muslim migrants, the Jewish people and other members of society. According to its terms, the divergent groups pledged to live peacefully, to fulfil the rights of one another and to foster a spirit of mutual sympathy, tolerance and cooperation.

The Holy Prophet Muhammad (peace and blessings of Allah be upon him) was elected as the head of state and under his leadership, the covenant proved to be a magnificent charter of human rights and governance and it ensured peace between the different communities. The Prophet of Islam (peace and blessings of Allah be upon him) established an impartial judiciary for dispute resolution. He made it clear that there would be one law for the rich and powerful and for the poor and weak and all people would be treated equally according to the law of the land.

For example, on one occasion, an

affluent lady committed a crime and many people suggested that, given her high standing in society, it was better to turn a blind eye to her crimes. The Holy Prophet Muhammad (peace and blessings of Allah be upon him) rejected their advice and made it clear that even if his daughter committed an offence, she too would be subject to the law and no favouritism or nepotism would occur.

In addition, the Prophet of Islam (peace and blessings of Allah be upon him) established an excellent education system, through which the intellectual standards of that society were raised. Literate and well-educated people were instructed to teach the illiterate. Special measures were put in place to provide education to orphans and other vulnerable members of society. This was all done so that the weak and powerless could stand on their own two feet and advance.

A taxation system was established, whereby taxes were levied on wealthier members of society and the proceeds were used to provide financial aid for disadvantaged members of society. According to the teachings of the Holy Quran, the Prophet of Islam (peace and blessings of Allah be upon him) established a code of business and financial ethics to ensure that trading was fair and honest.

In an age when slavery was rampant and slave-owners treated their slaves mercilessly, the Prophet of Islam (peace and blessings of Allah be upon him) sought to bring about a

revolution in society. Slave-owners were ordered to treat their slaves with compassion and respect and the Holy Prophet Muhammad (peace and blessings of Allah be upon him) repeatedly urged them to free them.

Also, under the leadership of the Holy Prophet Muhammad (peace and blessings of Allah be upon him), a system of public sanitation was developed. A city cleaning programme was implemented and people were educated about the importance of personal hygiene and physical health. The roads of the city were expanded and improved. A census was conducted to collect data and to identify the needs of the citizens.

Thus, during the 7th Century, under the government led by the Prophet of Islam (peace and blessings of Allah be upon him), astonishing progress was made in Madinah to advance the cause of individual and collective rights. Indeed, for the very first time amongst the Arabs, an orderly and civilised society was established.

In many ways, it was a model society, in terms of infrastructure, services and more importantly, in terms of the unity and tolerance displayed in what was a multicultural society. The Muslims were immigrants, yet they integrated smoothly into the local society and contributed to its success and development.

Moving on, in terms of the teachings of Islam, it is a cause of profound sadness that in today's world, the Holy Prophet of Islam (peace and blessings of Allah be upon him) has been grievously mischaracterised. He has been branded as a belligerent leader, when nothing could be further from the truth.

The reality is that the Prophet of Islam (peace and blessings of Allah be upon him) spent every moment of his life championing the rights of all people and through the teachings of Islam, he established an incomparable and timeless charter of human rights. For example, he taught that people should respect the beliefs and feelings of one another. They should abstain from criticising what others held sacred.

Once, a Jewish person came to him and complained about the conduct of one of his closest companion. The Prophet of Islam (peace and blessings of Allah be upon him) summoned him and asked what had transpired. He said that the Jew had claimed that Moses (peace be upon him) was superior in rank to the Prophet of Islam (peace and blessings of Allah be upon him) and he could not tolerate this. He had strongly refuted it and said that the Holy Prophet of Islam (peace and blessings of Allah be upon him) was of a higher rank.

Upon this, the Holy Prophet Muhammad (peace and blessings of Allah be upon him) expressed his displeasure with his closest confidant and said that he should not have argued with the Jew and should instead have respected his religious sentiments. These were his peerless teachings and in my view, it is deeply regrettable that the principle of mutual respect, which is the means of establishing love and unity, has been sacrificed in the modern world in the name of so-called freedom and even in the name of entertainment.

Even the founders of religion are no longer spared mockery and contempt, even though their derision causes anguish and pain to millions of their followers around the world. On the other hand, the Holy Quran goes as far as saying that Muslims should not even speak ill of the idols of others, because it will cause them distress and in turn, they may speak ill of God Almighty and consequently, the peace and unity of society would suffer.

In terms of fulfilling the rights of the weak and poor, the Holy Prophet of Islam (peace and blessings of Allah be upon him) established various schemes and projects to raise their standards of living and to ensure that they were not deprived of their dignity. He said that whilst most people afforded a high status to those who were wealthy and powerful, a poor person who was moral and considerate had far greater value, than a rich person who cared not for the feelings of others and merely lived off his name.

Even in small matters, the Holy Prophet of Islam (peace and blessings of Allah be upon him) paid great attention to ensuring that the feelings of underprivileged people were protected. For example, he instructed Muslims to always invite the poor and needy to their dinner parties or social gatherings. If less affluent people were exploited by the rich or powerful, the Prophet of Islam (peace and blessings of Allah be upon him) instructed his followers to help the weaker party attain justice.

The Holy Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) always sought to eliminate slavery. In this regard, to his own followers, the Prophet of Islam (peace and blessings of Allah be upon him) repeatedly advocated the freeing of slaves and instructed that if it was not immediately possible for them to release them, then at the very minimum, they were to feed and clothe them, in the same way they fed and clothed themselves.

Another issue often raised is of women's rights and it is often alleged that Islam denies women's rights. Nothing could be further from the truth! Rather, Islam established the rights of women and girls for the first time. At a time when women and girls were discriminated against and often looked down upon, the Holy Prophet of Islam (peace and blessings of Allah be upon him) instructed his followers to ensure that girls were educated and respected.

Indeed, he said that if a person had three daughters, whom they educated and guided in the best way, they would be sure to enter paradise. This is contrary to the extremist's claim that a violent Jihad and the slaughter of non-Muslims will take a person to heaven.The Prophet of Islam (peace and blessings of Allah be upon him) taught that the way to enter heaven was by educating and instilling moral values within girls.

Based upon these teachings, Ahmadi Muslim girls across the world are educated and are excelling in various fields. They are becoming doctors, teachers and architects and entering other professions through which they can serve humanity. We ensure that girls are given equal access to education as boys. Hence, the literacy rate of Ahmadi Muslim girls in the developing world is at least 99%. Besides education, Islam was the religion that first gave women the right to inheritance, the right to divorce and many other human rights.

Furthermore, the Holy Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) emphasised the rights of one's neighbours and said that Allah the Almighty had placed such great emphasis upon their rights, that he came to think that neighbours would be classed amongst a person's rightful heirs. Thus, the Prophet of Islam (peace and blessings of Allah be upon him) established universal human rights that were due to each individual, irrespective of their beliefs, social status or ethnicity.

I have just spoken about how the Holy Prophet of Islam (peace and blessings of Allah be upon him) focused a great deal on the importance of education. This was reflected in the aftermath of the first battle in the history of Islam. Despite being extremely ill-equipped they were able to defeat the much stronger Makkan army with the help of Allah the Almighty.

Thereafter, the Holy Prophet Muhammad (peace and blessings of Allah be upon him) offered to release those prisoners of war who were literate, on condition they first taught illiterate members of society how to read and write. In this way, many centuries ago, the Prophet of Islam (peace and blessings of Allah be upon him) established a very successful model for the rehabilitation and re-integration into society of prisoners, which benefitted society at large.

It is often alleged that Islam is a religion of violence or warfare but the truth is and is stated in the Holy Quran that permission to fight back was granted to establish and preserve the principles of freedom of belief and freedom of conscience for all mankind. The Quran states that if the Muslims did not defend themselves against the Makkan army then no church, synagogue, temple, mosque or any other place of worship would be safe, because the opponents of Islam were determined to eliminate all forms of religion.

In reality, if the early Muslims engaged in warfare it was always defensive and fought for the sake of establishing long-term peace and to protect the right of all people to live with freedom.

If today there are Muslims who have adopted extremist tactics or who preach violence, it is because they have abandoned Islam's teachings or are wholly ignorant of it. Where individuals or groups conduct terrorism, it is to gain power or to enrich themselves. Similarly, where countries adopt unjust and extreme policies, their goals are invariably linked to gaining geo-political benefit and asserting their dominance over others. Their conduct has nothing to do with Islam.

The Holy Quran states very clearly that there should be no compulsion in matters of faith. Islam prohibits Muslims from aggression and so the Prophet of Islam (peace and blessings of Allah be upon him) and his four rightly guided Caliphs never sought war or violence, and, at all times, sought peace and reconciliation and made countless sacrifices in its cause.

Another allegation levelled against Islam by certain critics is that it is a backward and archaic religion or one that does not promote intellectual advancement. This is a lazy stereotype that is based on fiction rather than fact. It is a baseless allegation.The Holy Quran itself has signified the importance of education by teaching the prayer: "O my Lord, increase me in knowledge."

Where this prayer is a source of great help to Muslims, it also inspires them towards learning and advancing the cause of human knowledge.

The truth is that the Holy Quran and the teachings of the Holy Prophet of Islam (peace and blessings of Allah be upon him) inspired the works of generations of Muslim intellectuals, philosophers and inventors in the

Middle Ages. Indeed, if we look back more than a millennium, we see how Muslim scientists and inventors played a fundamental role in advancing knowledge and developing technologies, which transformed the world and remain in use today.

For example, the first ever camera was developed by Ibn Haytham and his revolutionary work was recognised by UNESCO, when he was declared as a 'pioneer of modern optics.' It is also interesting to note that the word 'camera' is derived from the Arabic word 'qamara.'

In the 12th Century, a Muslim cartographer produced what was regarded as the most extensive and accurate world map of the medieval times, which was used for centuries by travellers.

Furthermore, in the field of medicine, many Muslim physicians and scientists made great discoveries and pioneered many inventions that remain in use today. Many of the surgical instruments were pioneered by the Muslim physician Al-Zahrawi in the 10th Century.

In the 17th century, an English physician, William Harvey famously carried out what was considered as ground-breaking research regarding blood circulation and the functioning of the heart. However, it was later discovered that more than 400 years before Harvey's research, Ibn Nafees, an Arab physician, had already detailed the basics of pulmonary circulation in an Arabic textbook.

In the 9th century, Jabir ibn Hayyan brought about a revolution in the field of chemistry. He invented many of the basic processes and apparatus still in use today.

The principles of Algebra were first developed by a Muslim, as was much of the theory of Trigonometry.

In the modern world, algorithms are the basis of modern computing technology and they too were first developed by Muslims.

The contribution of Muslims to intellectual enlightenment is still recognised.

For example, a New York Times article, published by their Science Reporter, Dennis Overbye, mentions the role of the Muslim polymath Al-Tusi. The author states:

"Al-Tusi published many great works on astronomy, ethics, mathematics and philosophy, marking him as one of the great intellectuals of his age…Muslims created a society that in the Middle Ages was the scientific centre of the world. The Arabic language was synonymous with learning and science for 500 years, a golden age that can among its credits for the precursors to modern universities…"

Hence, from the outset, Islam emphasised the immense value of learning and pushing the boundaries of human knowledge.

Since it was founded in 1889, the Ahmadiyya Muslim Community has always promoted education amongst its members. With the Grace of Allah, the very first Muslim Nobel Laureate was an Ahmadi Muslim, Professor Dr Abdus Salam, an eminent physicist who won the Nobel Prize for Physics in 1979. Throughout his life, Professor Salam spoke of how Islam, and the Holy Quran in particular, was the inspiration and guiding light behind his work. In fact, he used to say that there were around 750 verses in the Holy Quran directly related to science and which enhanced our understanding of nature and the universe.

Furthermore, the Third Caliph of our Community desired for a new dawn of great Muslim scientists and academics to emerge and so, within our Community, he started a tradition of awarding gold medals for academic excellence. Each year, hundreds of Ahmadi Muslim boys and girls or men and women are awarded gold medals.

Certainly, we believe that access to education is key to breaking the cycle of poverty that has plagued economically weak countries for generations. We learn this from the Holy Prophet of Islam (peace and blessings of Allah be upon him) who urged Muslims to fund the education of vulnerable members of society, such as orphans.

He taught that spiritual advancement was intrinsically linked to serving humanity and so a Muslim could not attain the love of God Almighty just through worship and prayer,

rather the love of God Almighty required Muslims to serve humanity. Thus, in chapter 90, verses 15 to 17 of the Holy Quran, Muslims are instructed to work to eradicate hunger and poverty, to fulfil the needs of orphans and to educate vulnerable and poor children, so that opportunities open up for them to develop.

In all parts of the world, the Ahmadiyya Muslim Community acts upon these noble teachings to the best of our abilities. We believe that Islam is a religion of love and compassion and so we serve humanity without making any distinction based on the religion or ethnicity of those who we help.

Therefore, in remote and poverty-stricken parts of Africa, we have established primary and secondary schools and we have also opened hospitals and clinics. We are providing clean running water in remote villages, which mean that children are free to go to school, instead of spending their days travelling for miles seeking to collect pond-water for their domestic family use.

We have also set up a project of building model villages, which include community halls, access to clean water, solar energy infrastructure and various other facilities. All of these services are provided to the local people, irrespective of their background or beliefs and are motivated entirely by our religion.

Where, out of human sympathy, we seek to eradicate poverty and destitution, we also consider it to be the key to developing sustainable peace in the world. Only if people have food to eat, water to drink, shelter, schooling for their children and healthcare will they be able to live in peace and escape the deadly clutches of frustration and resentment that lead people towards extremism.

These are all basic human rights and so until we help people flee poverty and destitution, we will not see true peace in the world.

At the end, I pray with all my heart that mankind forsakes greed and forgoes the pursuit of narrow self-interests and instead focuses on relieving the pain and anguish of those who are suffering in the world.

With these words, I would like to once again thank you for joining us here this evening.

Thank you very much."

(রিভিউ অব রিলিজিয়ন্সের সৌজন্যে)

DR. NAZIFA'S Smile Aid
your complete dental healthcare

Oral & Dental Surgery
Dental Fillings
Root Canal Treatment
Dental Crowns, Bridges
Teeth Whitening
Dental Implant
Orthodontics (Braces)
In-House Dental X-RAY

Consultation Days :: Tuesday - Friday
For Appointment :: 01703 720 606
https://goo.gl/maps/UjX3RdaVzJ22
fb.me/DrSmileAid

Dr. Nazifa Tasnim
Chief Consultant
Oral & Dental Surgeon
BMDC Reg. NO :: 4299
BDS (DU), PGT (BSMMU)
Specially Trained in Fixed Orthodontic Braces

Smile Aid
444, Kuwaiti Mosque Road
(Apollo Hospital-DhaliBari Link Road)
Shahid Muktijoddha Din Mohammad Dilu Bhaban
Adjacent to Basundhara R/A, Block A (Dhali Bari Pocket Gate)
Vatara, Dhaka - 1212

Consultation Days :: Saturday - Monday
For Appointment :: 01996 244 087
01778 642 471

Consultant
Holy-Lab Hospital & Diagnostic Center
KumarShil Mor, Brahmanbaria

শিক্ষা বিস্তার ও মানবসেবা প্রদানের ইসলামী নীতিমালা

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-এর ঐতিহাসিক ভাষণ

[গত ৮ অক্টোবর ২০১৯ ইউনেস্কোর সদর দপ্তর ফ্রান্সের প্যারিসে হুযূর (আই.) অনবদ্য এ ভাষণটি প্রদান করেন।]

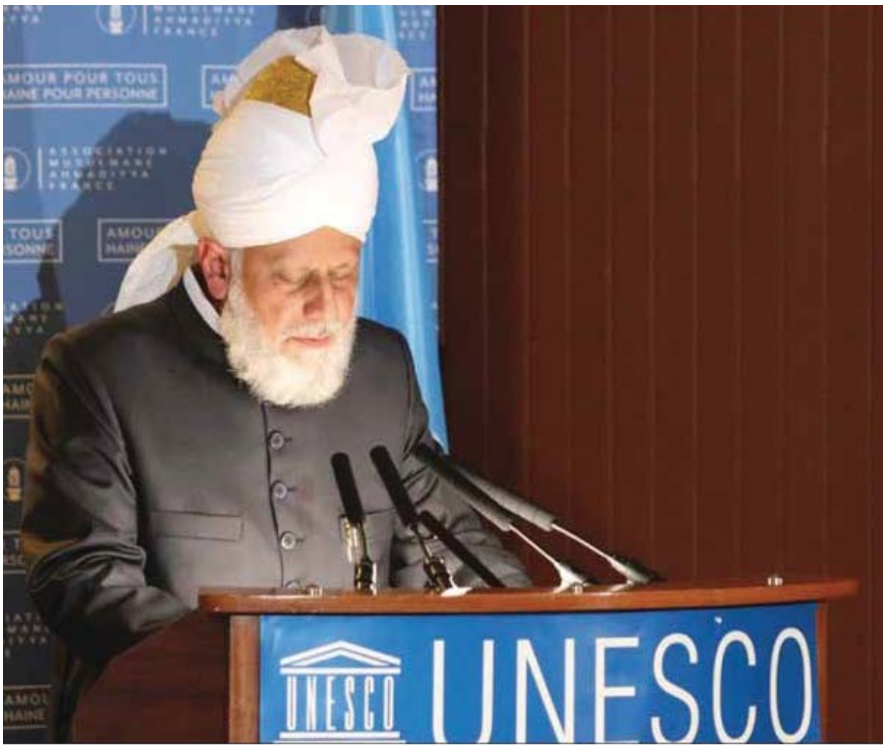

তাশাহ্হুদ তাঊয পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন-

শুধীমণ্ডলী! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আপনাদের সবার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। এই অনুষ্ঠান করার যে সুযোগ ইউনেস্কো প্রশাসন দিয়েছে, সেজন্য প্রথমেই আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। একই সাথে আমাদের সেসব অতিথিবৃন্দকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই, যারা আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে এমন একজনের বক্তৃতা শুনতে এসেছেন, যিনি একজন রাজনীতিবিদও নন, রাজনৈতিক নেতাও নন, বিজ্ঞানীও নন, বরং একটি ধর্মীয় সংগঠন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের নেতা এবং প্রধান।

ইউনেস্কো একটি মহৎ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একটি প্রশংসনীয় উদ্দেশ্যে ইউনেস্কো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইউনেস্কোর উদ্দেশ্য, আমি যা জানি তা হল, শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, আইনী শাসন প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার এবং সারা বিশ্বে শিক্ষাকে উৎসাহিত করা। ইউনেস্কো প্রেস বা সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা এবং বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সুরক্ষায় বিশ্বাসী। এর আরেকটি লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হল দারিদ্র বিমোচন, স্থায়ী বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিৎ করা আর এ বিষয়টিও নিশ্চিত করা যে, মানবজাতি এমন একটি ভবিষ্যৎ যেন পিছনে রেখে যেতে পারে যা থেকে পরবর্তী প্রজন্ম কল্যাণমণ্ডিত হবে।

আপনারা এটি জেনে আশ্চর্য হবেন যে, ইসলামী শিক্ষা মুসলমানদেরকে এই একই লক্ষ্য বাস্তবায়নে কাজ করতে বলে, আর মানবজাতির ক্রমাগত উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য সংগ্রাম করে যেতে বলে। এই শিক্ষা পবিত্র কুরআনের সূচনায় প্রথম সূরাতেই বিধৃত আছে, যাতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা

> *"ইসলামে–*
>
> * *১৪০০ বছর পূর্বেই ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সুরক্ষা দেয়া হয়েছে*
> * *কন্যাশিশুদেরকে শিক্ষা দেয়া এবং মেয়েদের নৈতিক মান উন্নত করার প্রতি সবিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে*
> * *অবাধ শিক্ষার সুযোগেই বিশ্বশান্তির মূল চাবিকাঠি নিহিত*
> * *ইসলাম জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি-অগ্রগতিতে মানুষকে উৎসাহ দিয়ে জ্ঞানের সাধনায় অনুপ্রাণিত করে*
> * *বিজ্ঞান এবং ধর্মের মাঝে কোনও দ্বন্দ্ব নেই*
> * *আধ্যাত্মিক উন্নতি মানবসেবার সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত"*

সারাবিশ্বের প্রতিপালক প্রভু। এটি ইসলামী বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু। এতে মুসলমানদেরকে এ কথাই শিখানো হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা শুধু মুসলমানদেরই প্রভু বা জীবিকাদাতা নন, বরং তিনি সমগ্র মানবজাতির প্রভু এবং জীবিকাদাতা। তিনি অত্যন্ত দয়ালু এবং বার বার দয়া প্রদর্শন করেন। রং, ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সবার চাহিদা তিনি পূরণ করেন; বরং পুরো সৃষ্টিজগতের চাহিদাই পূরণ করেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সত্যিকার একজন মুসলমান, এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, সব মানুষ সমান এবং বিশ্বাসে তারতম্য থাকা সত্ত্বেও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং সহনশীলতার মূল্যবোধ সমাজে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।

ইসলামের খুব সুন্দর একটি নীতির কথা কুরআনের সূরা বাকারার ৩৯ নম্বর আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে আর তা হল-মুসলমানদের উচিত, আল্লাহ্‌র পন্থা অবলম্বন করা, আল্লাহ্‌র নীতি অবলম্বন করা এবং তাঁর গুণাবলীতে রঙ্গীন হওয়া। যেভাবে এটি উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র রহমত সর্বব্যাপী এবং তিনি সব মানুষের জীবিকাদাতা আর এমনকি তাদেরও জীবিকাদাতা যারা তাঁকে অস্বীকার করে। তাঁর সম্পর্কে যারা অনবরত অপলাপ করে এবং পৃথিবীতে নিষ্ঠুর কার্যকলাপ পরিচালনা করছে, তাদেরকেও তিনি রিয্‌ক দিয়ে থাকেন। ইসলামে শাস্তির যে দর্শন আল্লাহ্ তা'লা উল্লেখ করেছেন, তা পরকালের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ইহ-জীবনে আল্লাহ্ তা'লা সব মানুষের ওপর লাগাতার দয়া এবং রহমতের বারী বর্ষণ করেন। মুসলমানদেরকে আল্লাহ্ স্বীয় গুণাবলী অনুধাবন করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা এটি বলেছেন যে, তোমাদের উচিত সৃষ্টির প্রতি দয়া, মায়া আর ভালোবাসা প্রদর্শন করা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যেক মুসলমানের ধর্মীয় দায়িত্ব হল অন্যের চাহিদা পূরণ করা, তা সে যে ধর্মেরই অনুসারী হোক না কেন বা যে সংস্কৃতির সাথেই তার সম্পর্ক থাকুক না কেন বা যে দল বা গোষ্ঠীরই সদস্য সে হোক না কেন। আরও বলা হয়েছে যে, সবার প্রতি দয়ার্দ্র এবং সহানুভূতিশীল হও এবং অন্যের আবেগ অনুভূতির প্রতি সংবেদনশীল এবং মমতাশীল হও।

এছাড়াও কুরআন বলে যে, ইসলামে রসূল (সা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা পাঠিয়েছেন অসাধারণ এবং অতুলনীয় রহমতের উৎস হিসেবে এবং সমগ্র মানবজাতির প্রতি আশীর্বাদ হিসেবে। ইসলামের ভিত্তি রাখার পর মক্কার অমুসলিমদের পক্ষ থেকে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) এবং তাঁর অনুসারীদের ওপর নৃশংস ও অমানবিক অত্যাচার এবং নির্যাতন করা হয়েছে, যা তারা ধৈর্য্যের সাথে এবং সহনশীল মনমানসিকতার সাথে মোকাবেলা করেছেন। দীর্ঘ দিনের অত্যাচার এবং অনাচারের পর তারা মদিনায় হিজরত করেন, যেখানে হযরত মুহাম্মদ (সা.) অভ্যাগত মুসলমান, ইহুদী ও অন্যান্যদের মাঝে একটি শান্তি-চুক্তি করেন। সেই শান্তি-চুক্তির শর্ত অনুসারে সব দল শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের অঙ্গীকার করে। পরস্পরের অধিকার প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং পারস্পরিক সহানুভূতির প্রেরণা এবং সহনশীলতার চেতনায় বসবাসের অঙ্গীকার করে। সেই চুক্তি অনুসারে ইসলামের রসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে নির্বাচন করা হয়। তাঁর নেতৃত্বে প্রণীত সেই শান্তি-চুক্তি বা 'মদীনা সনদ' মানবাধিকার এবং রাষ্ট্রপরিচালনার এক অতুলনীয় সংবিধান হিসেবে কাজ করে আর এটি বিভিন্ন দল এবং গোষ্ঠীর মাঝে শান্তির বিষয়টি নিশ্চিত করে।

ইসলামের রসূল (সা.) একটি বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন, যাতে হস্তক্ষেপের কোন সুযোগ কারোরই ছিল না। এ বিষয়টি তিনি নিশ্চিত করেছেন যে, আইন ধনী-দরিদ্র, শক্তিশালী ও দুর্বল, সবার জন্যই সমান। সর্বক্ষেত্রে একই আইন কার্যকর হবে এবং সব মানুষকে দেশের আইন অনুসারে সমভাবে দেখা হবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, একবার সম্পদশালী এক নারী কোন একটি অপরাধ করে আর অনেকেই এই প্রস্তাব দেয় যে, যেহেতু সমাজে তার পদমর্যাদা অনেক উঁচু ও মহান, তাই তার দোষ এবং ভুল উপেক্ষা করা উচিত। কিন্তু, স্বীয় শিক্ষার অনুসরণ করতে মহানবী (সা.) তাদের প্রস্তাব উপেক্ষা করেন আর এটি স্পষ্ট করেন যে, তার মেয়েও যদি এই অপরাধ করতো, তাহলে তাকেও আইন অনুসারেই দেখা হত আর কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব বা স্বজন-প্রীতি প্রদর্শন করা হতো না। এছাড়া ইসলামের রসূল (সা.) খুবই কার্যকর এক শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যার কারণে সেই সমাজ অনেক উন্নতি করে। শিক্ষিত শ্রেণিকে বলা হয়েছিল অশিক্ষিতদেরকে শিক্ষা দিতে আর এজন্য এতিম এবং সমাজের অন্যান্য দুর্বল শ্রেণির শিক্ষাদীক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা হাতে নেয়া হয়। এ সবকিছু করা হয় এজন্য যে, দরিদ্র এবং ক্ষমতাহীন এবং দুর্বল শ্রেণি যেন নিজ পায়ে দাঁড়াতে পারে।

এমন একটা কর-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়, যার ভিত্তিতে সমাজের সম্পদশালী মানুষের ওপর কর আরোপ করা হয় আর তাতে যা আসতো, তা সমাজের সুবিধা-বঞ্চিতদের জন্য ব্যবহার করা হতো। কুরআনের শিক্ষা অনুসারে ইসলামের রসূল (সা.) ব্যবসা-নীতি বা অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রবর্তন করেন এটি নিশ্চিত করার জন্য, যেন ব্যবসা-বাণিজ্য সততার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। দাসপ্রথা যখন সমাজের সর্বত্র বিরাজমান ছিল, তখন দাসদের সাথে অত্যন্ত নির্দয় ব্যবহার করা হোত।

এ ক্ষেত্রে ইসলামের রসূল (সা.) সমাজে এক বিপ্লব আনতে চেয়েছিলেন। মনিবদেরকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, দাসদের প্রতি তারা যেন দয়ার্দ্র এবং সম্মানজনক ব্যবহার করে। তাদেরকে স্বাধীন করার নির্দেশও হযরত মুহাম্মদ (সা.) বার বার দেন এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর নেতৃত্বে একটা গণ পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাও গড়ে তোলা হয়। শহর পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করার পরিকল্পনাও প্রণীত হয় আর পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা এবং দৈহিক স্বাস্থ্যের গুরুত্বও মানুষকে বুঝানো হয়। রাস্তা-ঘাট সম্প্রসারিত করা হয়, ডাটাবেজড তথ্য সংগ্রহ এবং সাধারণ মানুষের চাহিদা বা প্রয়োজনের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার জন্য আদমশুমারি করা হয়।

সপ্তম শতাব্দীতে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর নেতৃত্বাধীন সরকারের তত্ত্বাবধানে ব্যক্তি এবং সমাজের অধিকার নিশ্চিত হওয়ায় মদীনায় অসাধারণ উন্নতি ঘটে। আরবদের মাঝে সর্বপ্রথম এক সুশৃঙ্খল সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, যা অবকাঠামোগত ভাবে সেবা, ঐক্য আর সহনশীলতার দৃষ্টিকোণ থেকে সত্যিকার অর্থেই এক আদর্শ সমাজব্যবস্থা ছিল। মুসলমানরা সেখানে ইমিগ্রেন্ট বা অভ্যাগত হলেও স্থানীয় সমাজে তারা পুরোপুরি মিশে যায় এবং সমাজের সাফল্য এবং উন্নতির ক্ষেত্রে অবদান রাখে।

এটি খুবই গভীর এক দুঃখের বিষয় যে, আজকের পৃথিবীতে ইসলামের রসূল (সা.)-এর

ওপর নির্দয় ও নির্মমভাবে হামলা করা হয়। তাঁর চরিত্র হনন করা হয়, তাঁকে এক যুদ্ধংদেহী নেতা হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। অথচ সত্যের সাথে এর দূরতম কোন সম্পর্কও নেই।

বাস্তব অর্থে ইসলামের রসূল (সা.) তাঁর জীবনের প্রতিটি মূহুর্ত সব মানুষের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য কাজ করেছেন। ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে মানবাধিকারের এক অতুলনীয় ও দুস্প্রাপ্য সনদ তিনি রেখে গেছেন । দৃষ্টান্তস্বরূপ, তিনি (সা.) বলে গেছেন, মানুষের উচিত, সব ধর্মের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আবেগ-অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবং অন্যদের বিরূপ সমালোচনা করা থেকে বিরত থাকা।

একবার এক ইহুদী তাঁর (সা.) কাছে আসে এবং অভিযোগ করে যে, তাঁর (সা.) এক সাহাবী তার সাথে অসদাচরণ করেছে। ইসলামের রসূল (সা.) সেই সাহাবীকে ডেকে পাঠান এবং তাকে জিজ্ঞেস করেন যে কী হয়েছে? সেই সাহাবী বলেন যে, ইহুদী বলছে, হযরত মূসা (আ.) মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর চেয়ে বড় বা শ্রেষ্ঠ, তাই সেই সাহাবী এটি সহ্য করতে পারেন নি আর এই কারণে তিনি কঠোর যুক্তি দ্বারা সেই ইহুদীর যুক্তি খণ্ডন করেন এবং বলেন যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পদমর্যাদাই বড়।

এটি শুনে হযরত মুহাম্মদ (সা.) তার অসন্তোষ ব্যক্ত করেন এবং বলেন যে, ইহুদীর সাথে বিতর্ক করা উচিত হয় নি বরং তার ধর্মীয় আবেগ অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করুন এবং বলুন যে, আপনি অন্যায় করেছেন। এই ছিল সেই অতুলনীয় শিক্ষা। আমার দৃষ্টিতে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসা এবং ঐক্যের যে ভিত ছিল, তা আজকের যুগে 'ভুলে বসা' হয়েছে, সেটাকে জলাঞ্জলি দেয়া হয়েছে আর তা করা হচ্ছে তথাকথিত 'স্বাধীনতা ও বিনোদন'-এর নামে।

এমনকি বিভিন্ন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতারাও আজ এই ধরনের তিরস্কার এবং আক্রমণের হাত থেকে নিরাপদ নন। এর ফলে সেই ধর্মের মানুষ যদি মর্ম-যাতনায়ও ভুগে, সেটিকে ভ্রুক্ষেপ করা হয় না। অপর দিকে কুরআন করীম আমাদেরকে বলে যে, এক মুসলমানের জন্য অন্য ধর্মের প্রতিমার প্রতিও কঠোর ভাষা ব্যবহার করা অনুচিত; কেননা, এর প্রত্যুত্তরে তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে অপলাপ করবে বা করতে পারে আর একারণে সমাজের শান্তি এবং ঐক্য বিনষ্ট হবে।

দুর্বল ও দরিদ্রদের অধিকার নিশ্চিত করার দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখা যাবে যে, ইসলামের রসূল (সা.) বিভিন্ন স্কীম এবং প্রজেক্ট হাতে নিয়েছিলেন জীবনযাপনের মানকে উন্নত করার জন্য আর এটি নিশ্চিত করার জন্য যে, মানুষের আত্মসম্মানবোধ যেন পদদলিত না হয়। তিনি (সা.) বলেন, সমাজের বেশিরভাগ মানুষ যেখানে সম্পদশালী এবং শক্তিশালী লোকদেরকে সম্মান দিয়ে থাকে, সেখানে এমন এক ব্যক্তি, যে নৈতিকতায় সজ্জিত কিন্তু দরিদ্র, সে সম্পদশালীর চেয়ে অনেক বেশি সম্মানিত। তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়াদীর প্রতিও ইসলামের রসূল (সা.) গভীর মনোযোগ দিয়েছেন এবং এটি নিশ্চিত করেছেন যে, যারা সুবিধা-বঞ্চিত মানুষ, তাদের অধিকার যেন প্রতিষ্ঠা করা হয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, মুসলমানদেরকে তিনি (সা.) বলেছেন, দরিদ্র এবং অভাবীদেরকে তোমাদের ভোজ-সভায় আমন্ত্রণ জানাবে। মুহাম্মদ (সা.) তাঁর অনুসারীদেরকে বলেছেন যে, সম্পদশালীরা যদি কর্মক্ষম মানুষদের অধিকার কুক্ষিগত করে, তবে দুর্বলপক্ষকে তোমরা সাহায্য করবে যেন তারা ইনসাফ পায় আর ইনসাফ যেন পদদলিত না হয়।

ইসলামের রসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.) দাসপ্রথা নির্মূল করার সকল প্রচেষ্টা বা পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং সবসময় তাঁর অনুসারীদেরকে দাসমুক্ত করার বিষয়ে বারবার উৎসাহিত করেছেন এবং বলেছেন, তাৎক্ষণিকভাবে দাসমুক্ত করা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে ন্যুনতম তাদের যা করা উচিত তাহল- তাদেরকে তাই খাওয়ানো এবং পরিধান করানো, যা তারা নিজেরা খায় এবং পরিধান করে।

সচরাচর আরেকটি বিষয় যা উঠানো হয় তাহল- নারী অধিকার সংক্রান্ত। প্রায়শঃ এই অভিযোগ আরোপ করা হয় যে, ইসলাম মহিলাদের অধিকার খর্ব করে তাদের প্রাপ্য অধিকার দেয়া হয় না। সত্যের সাথে এ কথাটির কোনই সম্পর্ক নেই। সত্যিকার অর্থে ইসলামই প্রথমবার নারী এবং মহিলাদের প্রাপ্য অধিকার দিয়েছে এমন এক সময়ে; যখন নারীরা বা মহিলারা ছিল বৈষম্যের শিকার বা তাদেরকে হেয় এবং তুচ্ছ জ্ঞান করা হতো।

ইসলামের রসূল (সা.) তাঁর অনুসারীদেরকে বলেছেন যে, নারীদেরকে যেন সঠিক শিক্ষাদীক্ষা দেয়া হয় এবং তাদের প্রতি যেন শ্রদ্ধাবোধ প্রদর্শন করা হয়। সত্যিকার অর্থে তিনি এটিই বলেছেন যে, কারো যদি তিনজন কন্যাসন্তান থাকে, তাদেরকে যদি সে সঠিক শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে থাকে এবং সঠিক পথ-প্রদর্শন করে, তাহলে এমন ব্যক্তি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।

উগ্রপন্থীদের এ দাবি সম্পূর্ণভাবেই ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী যে, সহিংসতা, জিহাদ এবং অমুসলিমদেরকে জবাই করার কাজটি কোন ব্যক্তিকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। ইসলামের রসূল (সা.) বলেছেন, জান্নাতে প্রবেশের একটি উপায় হল মেয়েদেরকে সুশিক্ষিত করা এবং তাদেরকে নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা। এই শিক্ষার ভিত্তিতে সারাবিশ্বে আহমদী মেয়েরা শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করছে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে তারা অগ্রসর রয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা ডাক্তার হচ্ছে, শিক্ষক-শিক্ষিকা হচ্ছে এবং প্রকৌশলী হচ্ছে। অন্যান্য বিষয়েও তারা প্রথম সারিতে রয়েছে।

আমরা এ বিষয়টি নিশ্চিত করি যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েরা যেন ছেলেদের মতই সমান সুযোগ পায়। উন্নত বিশ্বে আহমদী মেয়েদের শিক্ষার হার শতকরা নিরানব্বই অর্থাৎ একশ' জনের মধ্যে নিরানব্বই জনই শিক্ষিত। ইসলাম এমন একটি ধর্ম, যা শিক্ষার পাশাপাশি সর্বপ্রথম নারীদেরকে উত্তরাধিকার দিয়েছে; দিয়েছে তালাক দেয়ার অধিকার বা খোলা নেয়ার অধিকার। এছাড়া আরো অনেক মানবাধিকার প্রথমবার ইসলাম'-ই মহিলাদেরকে দিয়েছে।

এছাড়া ইসলামের রসূল (সা.) প্রতিবেশীর অধিকারের ওপর অনেক জোর দিয়েছেন। তিনি বলেন, প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা এতটা গুরুত্বারোপ করেছেন যে, [মহানবী (সা.) ভাবতে থাকেন যে] হয়তো প্রতিবেশীকেও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করে দেয়া হবে। এভাবে ইসলামের রসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিশ্বমানবাধিকার নিশ্চিত করেছেন- যাতে গায়ের রং, ধর্ম-বর্ণ-গোত্র,

সামজিক পদমর্যাদার উর্ধ্বে থেকে প্রত্যেকে তার প্রাপ্য নিশ্চিতভাবে পায়।

ইসলামের রসূল (সা.) শিক্ষার ওপর অনেক গুরুত্বারোপ করেছেন। এ বিষয়টি ইসলামের ইতিহাসে প্রথম যুদ্ধের (বদরের যুদ্ধের) পর স্পষ্টভাবে সামনে এসেছে। অস্ত্র-সস্ত্র না থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লার সাহায্যে মুসলমানরা মক্কাবাসীদের সেযুদ্ধে পরাস্ত করে। এরপর শিক্ষিত যুদ্ধ-বন্দিদের মুক্তি দেয়ার প্রস্তাব এই শর্ত হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.) সর্বপ্রথম দেন যে, তারা সমাজের অশিক্ষিত লোকদেরকে শিক্ষা ও জ্ঞান দান করবে বা লেখাপড়া শেখাবে। এভাবে বেশ কয়েকশত বছর পূর্বে ইসলামের রসূল (সা.) খুবই সফল এবং আদর্শ এক সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। পুনর্বাসন আর সমাজের যুদ্ধ-বন্দীদেরকে সমাজের মূল-ধারার সাথে একাকার করার উদ্দেশ্যেই তিনি এই পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিলেন। প্রায়শঃ এই অভিযোগ আরোপ করা হয় যে, ইসলাম সহিংস ধর্ম এবং যুদ্ধংদেহী ধর্ম। কিন্তু কুরআনে সেই সম্পর্কে যে সত্যটি উল্লিখিত আছে, তা হল বিশ্বাসের স্বাধীনতা এবং সব মানুষের বিবেক এবং বাক-স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে।

কুরআন বলে, মুসলমানরা যদি মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা না নিত, তাহলে কোন গীর্জা, ইহুদীদের ইবাদত স্থান, মন্দির বা মঠ এবং মসজিদ বা কোন ইবাদতগাহ নিরাপদ থাকতো না। কেননা, বিরোধীরা সকল প্রকার ধর্মকে নিশ্চিহ্ন এবং নির্মূল করে দেয়ার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিল। সত্যিকার অর্থে ইসলামের প্রথম যুগের মুসলমানরা যখনই যুদ্ধ করেছেন, সেই যুদ্ধ ছিল প্রতিরক্ষা-মূলক এবং তারা যুদ্ধ করেছেন দীর্ঘস্থায়ী শান্তির উদ্দেশ্যে ও মানুষের অধিকার প্রদান এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য।

আজকে যদি এমন কোন মুসলমান থেকে থাকে যারা উগ্রপন্থার অনুসরণ করে বা সহিংসতার আশ্রয় নেয়, তারা এটি এ জন্য করে যে তারা ইসলামের শিক্ষাকে ছেড়ে দিয়েছে বা ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞ। বিভিন্ন দল এবং ব্যক্তি যে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ পরিচালনা করে, তা করে ক্ষমতার জন্য এবং সম্পদশালী হওয়ার উদ্দেশ্যে বা সম্পদের লোভে। একইভাবে, কোন দেশ যদি অন্যায় এবং উগ্র-নীতির অনুসরণ করে, তাহলে তাদের লক্ষ্য এবং নীতি হচ্ছে ভূরাজনৈতিক স্বার্থ এবং অন্যের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করা। ইসলামী শিক্ষার সাথে তাদের আচরণের দূরতম কোন সম্পর্কও নেই। ইসলাম মুসলমানদেরকে আগ্রাসী আচরণ করতে বারণ করে।

ইসলামের রসূল (সা.) এবং তাঁর খোলাফায়ে রাশেদা কখনও সহিংসতা এবং যুদ্ধ পছন্দ করেন নি। তারা সব সময় শান্তিকে উৎসাহিত করেছেন আর এ উদ্দেশ্যে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। কিছু সমালোচক ইসলামের বিরুদ্ধে আরেকটি আপত্তিও উত্থাপন করে আর তাহল ইসলাম একটি সেকেলে এবং পশ্চাদপদ ধর্ম আর এটি জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি-অগ্রগতিতে বিশ্বাসী নয় বা এটিকে উৎসাহিত করে না। এটি পুরোনো, অসার আর গতানুগতিক একটি অভিযোগ, যা ইসলামের বিরুদ্ধে উত্থাপন করা হয় আর এটি ভিত্তিহীন এক অপবাদ। শিক্ষার বিষয়ে স্বয়ং কুরআন শরীফই গুরুত্বারোপ করেছে।

কুরআন স্বয়ং একটি দোয়া শিখিয়েছে যে, **'রাব্বি যিদ্‌নী ইলমান'** অর্থাৎ হে আমার প্রভু! আমাকে জ্ঞানে সমৃদ্ধ কর, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও। এই জ্ঞান যেখানে মুসলমানদের জন্য খুবই সহায়ক, সেখানে এটি সামগ্রিকভাবে মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও অত্যন্ত কাজের। সত্যিকার অর্থে কুরআন এবং ইসলামের রসূল (সা.) মধ্য যুগের বহু মুসলমান বুদ্ধিজীবি, দার্শনিক এবং আবিস্কারকদের মাঝে জ্ঞানের প্রেরণা জাগিয়েছেন। সত্যিকার অর্থে একহাজার বছর পূর্বের দিকে যদি আমরা তাকাই, তাহলে মুসলমান বিজ্ঞানী এবং আবিস্কারকগণ জ্ঞানের বিষয়টিকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছেন তা স্পষ্টভাবে সামনে আসে। তারা এমন সব প্রযুক্তি সামনে এনেছেন, যা পৃথিবীকে পরিবর্তন করে দিয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ক্যামেরা সর্বপ্রথম বানিয়েছেন ইবনে আল হাইতাম আর তার এ বৈপ্লবিক কাজকেই স্বীকৃতি দিয়েছে ইউনেস্কো এবং তাকে আধুনিক অপটিক্স-এর জনক আখ্যা দেয়া হয়। এটিও নোট করার যোগ্য যে, ক্যামেরা শব্দটি আরবী কামারা শব্দ থেকে উদ্ভুত। দ্বাদশ শতাব্দীতে একজন মুসলমান কার্ডোগ্রাফার অত্যন্ত বিস্তৃত এবং সঠিক বিশ্বম্যাপ প্রণয়ন করেছেন, মধ্যযুগে যা শত শত বছর ধরে পর্যটকরা ব্যবহার করেছে।

এছাড়া চিকিৎসার জগতে অনেক মুসলামান চিকিৎসক ও বিজ্ঞানী অসাধারণ আবিস্কারাদি সামনে এনেছেন। অনেক আবিস্কার এমনও রয়েছে, যা আজো ব্যবহৃত হচ্ছে। শৈল্য চিকিৎসার অনেক যন্ত্রপাতি মুসলমান চিকিৎসকরা আবিস্কার করেছেন, যেমন- দশম শতাব্দীতে এটি করেছেন আলজেহরাবী আর সপ্তশত শতাব্দীতে ইংরেজ ডাক্তার ইউলিয়াম হার্ভে। বলা হয়ে থাকে যে, ডাক্তার ইউলিয়াম হার্ভে যুগান্তকারী এক গবেষণাকর্ম সামনে এনেছেন, যার সম্পর্ক ছিল হৃদপিন্ডে রক্ত সঞ্চালন সম্পর্কিত এবং হৃদ-যন্ত্রের কার্যপ্রণালী সম্পর্কিত; কিন্তু পরে আবিস্কৃত হয়েছে যে এরও চারশত বছর পূর্বে একজন আরব ডাক্তার, ইবনে নফিস'ই এটি আবিস্কার করেন।

নবম শতাব্দীতে জাবের ইবনে হাইয়ান রসায়ন বিদ্যার জগতে এক বিপ্লব সাধন করেন। তিনি অনেক মৌলিক প্রসেস এবং যন্ত্রপাতি আবিস্কার করেন, যা আজো ব্যবহৃত হচ্ছে। বীজগণিতের যে সূত্র রয়েছে, সেটি প্রথমে এক মুসলমান আবিস্কার করেন তেমনিভাবে ত্রিকোনমিতির তত্ত্বগুলোও। আধুনিক যুগে এলগোরিদ্‌ম হচ্ছে কম্পিউটিং প্রযুক্তির ভিত্তি আর এটিও আবিস্কার করে প্রথমে একজন মুসলমান। মুসলমানদের ইন্টিলেকচুয়ালিটি এবং মেধার দিকটি আজো স্বীকার করা হয় বা স্বীকৃত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নিউইয়র্ক টাইমসে একটা প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে যা তাদের সাইন্স রিপোর্টার *ডেনিস অভার বাই* লিখেছেন। তাতে বহুবিদ্যাজ্ঞ মুসলমান নাসির আল দীন আলতুসির কথাও উল্লেখ রয়েছে। তিনি লিখেন যে আলতুসি জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ছেপেছেন আর নীতিশাস্ত্র, গণিত এবং দর্শন তাকে তার যুগের অনেক বড় এক চিন্তাবিদ আখ্যায়িত করেছে। এই লেখক আরো লিখেন যে, মুসলমানরা একটা সমাজ গঠন করেছিল, যা ছিল মধ্যযুগে পৃথিবীর বিজ্ঞানের কেন্দ্রস্থল। আরবী ভাষা এবং জ্ঞান সে যুগে ছিল সমার্থক শব্দ। প্রায় পাঁচশত বছর পর্যন্ত এই অবস্থা বিরাজ করে। এটি এমন একটি বিষয়, যা আধুনিক যুগের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়কে আলোকিত করছে।

তাই সূচনা থেকেই ইসলাম, শিক্ষার ওপর অনেক জোর দিয়ে আসছে আর মানুষের জ্ঞানের পরিধিকে ক্রমশঃ বিস্তৃত করে চলছে।

১৮৮৯ সনে আহমদীয়া মুসলিম জামাত প্রতিষ্ঠার পর জামা'তে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা তার অনুসারীদেরকে শিক্ষা এবং জ্ঞান অর্জনের ওপর অনেক জোর দিয়ে আসছেন।

আল্লাহ্ তা'লার ফজলে প্রথম মুসলমান নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ছিলেন একজন আহমদী– প্রফেসর আব্দুস সালাম। তিনি হচ্ছেন প্রখ্যাত এক পদার্থ বিজ্ঞানী, যিনি পদার্থবিদ্যায় ১৯৭৯ সনে নোবেল পুরস্কার পান। সারা জীবন আব্দুস সালাম এ কথার ওপর জোর দিয়েছেন যে, ইসলাম এবং কুরআন শরীফ তার সাফল্যের পিছনে সবচে' বড় অবদান রেখেছে। বরং সত্যিকার অর্থে তিনি বলতেন যে, কুরআন শরীফে এমন সাতশত পঞ্চাশটি আয়াত আছে, যা বিজ্ঞানের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত এবং যা আমাদেরকে প্রকৃতি এবং এ বিশ্বকে বুঝতে সাহায্য করে।

এছাড়াও আমাদের জামা'তের তৃতীয় খলীফা এমন এক প্রভাত দেখতে চেয়েছেন, যখন বড় বড় বিজ্ঞানী এবং শিক্ষাবিদ সামনে আসবে। এই স্বপ্নের কথা তিনিই ব্যক্ত করেছেন আর শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের জামা'তে যারা ভাল ফলাফল করে, তাদের মাঝে স্বর্ণপদক দেয়ার রীতি তিনিই প্রচলন করেন। প্রত্যেক বছর শত শত আহমদী ছেলে এবং মেয়ের মাঝে শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের সাফল্যের জন্য এই স্বর্ণপদক বিতরণ করা হয়। আমরা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি যে, শিক্ষা হল দারিদ্র বিমোচনের এমন একটি মাধ্যম, যার অভাবে বহু দরিদ্র দেশ প্রজন্ম পরম্পরায় অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে।

আমরা এগুলো শিখেছি ইসলামের রসূল (সা.)-এর কাছ থেকে, যিনি মুসলমানদেরকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করেছেন যে, সমাজের দুর্বল শ্রেণির শিক্ষা-দীক্ষার ওপর জোর দাও আর এতিমদেরকে শিক্ষা দাও। তিনি বলেছেন, আধ্যাত্মিক উন্নতি মানব সেবার সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। তিনি বলেন, মুসলমান কখনো শুধু ইবাদতের মাধ্যমে বা দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে না, বরং আল্লাহর ভালোবাসার একটি দাবি হল মানব সেবা করা।

কুরআন শরীফের ৯০ নম্বর সূরায় আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদেরকে বলেছেন যে, ক্ষুধা এবং দারিদ্র দূরীভূত করার জন্য তোমরা কাজ কর আর এতিমদের চাহিদা পূরণ কর এবং সমাজের দুর্বল এবং দরিদ্র শ্রেণির শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা কর, যেন তারাও উন্নতি করার সুযোগ পায়। পৃথিবীর সকল অংশে আহমদীয়া মুসলিম জামাত এই মহান শিক্ষার ওপর সাধ্যানুসারে আমল করে চলছে। আমরা বিশ্বাস করি যে, ইসলাম ভালোবাসা, দয়া-মায়া এবং সহানুভূতির ধর্ম।

আমরা মানবজাতির মাঝে ধর্ম-বর্ণের কোন বিভেদ না করে মানবজাতির সেবা নির্বিশেষে করে থাকি। বিভিন্ন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এবং দারিদ্র কবলিত এলাকায় আমরা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছি আর স্বাস্থ্যসেবায় হাসপাতাল এবং ক্লিনিক খুলেছি। প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে আমরা সুপেয় পানীয়-জল সরবরাহের ব্যবস্থা করি। তার অর্থ হলো ছেলে-মেয়েরা মাইলের পর মাইল পায়ে হেটে পানি সংগ্রহ করতে গিয়ে সময় নষ্ট করার পরিবর্তে স্কুলে যেতে পারে।

আমরা এমন একটা প্রজেক্ট (আধুনিক গ্রাম নির্মানের প্রজেক্ট) হাতে নিয়েছি, যার আওতায় কমিউনিটি হল, পানি সরবরাহ, সৌরশক্তি এবং বিভিন্ন অবকাঠামো এবং অন্যান্য মৌলিক চাহিদা মেটানোর ব্যবস্থা করছি। এই সবকিছু করা হচ্ছে স্থানীয় লোকদের মাঝে, তা তাদের পটভূমি বা বিশ্বাস যাই হোক না কেন। আমরা আমাদের ধর্মীয় অনুশাসন পালনার্থেই এ সবকিছু করার প্রেরণা পাই আর মানবের প্রতি সহানুভূতি নিয়েই আমরা দারিদ্রবিমোচনের কাজ করছি। আমরা বিশ্বাস করি যে, এটি পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তির ভিত রচনার কারণ হতে পারে। মানুষের জন্য খাবার আর পানীয়-জল যদি থাকে আর মাথার ওপর একটা ছাদ থাকে, সন্তান-সন্ততিকে শিক্ষা দানের জন্য স্কুল থাকে, স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা করা হয়, কেবল তবেই তারা শান্তিতে বসবাস করতে পারে এবং নৈরাশ্যের ভয়াবহ থাবা থেকে মুক্তি পেতে পারে আর সেই মর্মজ্বালা থেকে মুক্তি পেতে পারে, যা ধর্মীয় উগ্রতায় পর্যবসিত হয়। এগুলো মৌলিক মানবাধিকার। মানুষকে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা দারিদ্র থেকে মুক্ত করতে না পারব, নৈরাশ্য থেকে মুক্ত করতে না পারব, পৃথিবীতে আমরা শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হব না।

শেষের দিকে আমি এ আন্তরিক দোয়া করব যে, মানবজাতি যেন লোভ-লিপ্সা থেকে মুক্ত হয় এবং সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতা ছেড়ে দেয় আর সমাজে যারা সুবিধা-বঞ্চিত এবং সমস্যা কবলিত, তাদের দুঃখ এবং কষ্ট দূরীভূত করার চেষ্টা করে। এই কয়েকটি কথার মাধ্যমেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং আজকের এই সান্ধ্য-অধিবেশনে যোগ দেয়ার জন্য পুনরায় আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

*ভাষান্তর: **মওলানা ফিরোজ আলম***
সেন্ট্রাল বাংলা ডেস্ক

কলমের জিহাদ

আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারমর্ম হলো-
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'
- ইমাম মাহদী (আ.)

"ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নাই"
- আল কুরআন

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মন্ডল

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর-১০৬)

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সংগে ধর্মীয় বিষয়ে দ্বিতীয় মত-পার্থক্য ঃ কি এবং কেন ?

হযরত ঈসা (আ.) ইন্তেকাল করেছেন অথবা তিনি এখনও আকাশে সশরীরে জীবিত আছেন– এই দুই প্রকার বিশ্বাস সম্পর্কিত মত-পার্থক্য–

আহমদীয়া মুসলমানদের বিশ্বাসঃ বনী ইস্রায়েলী নবী হযরত ঈসা (আ.) ইন্তেকাল করেছেন–

যীশুখৃষ্ট অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু সম্পর্কে প্রধানত চার প্রকারের বিশ্বাস রয়েছেঃ ১– ইহুদীদের বিশ্বাসঃ যীশুকে তারা ক্রুশে লটকিয়ে বধ করেছে। অতএব সে অভিশপ্ত এবং তাঁর সকল দাবী মিথ্যা।

২– খৃষ্টানদের বিশ্বাসঃ ক্রুশে অভিশপ্ত মৃত্যু বরণ করলেও যীশু তিন দিন পর আবার জীবিত হয়ে তাঁর পিতার কাছে উঠে গেছেন এবং মানুষের আদিপাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন।

৩– বহু মুসলমানদের বিশ্বাসঃ ক্রুশে লটকাবার পূর্বে যীশুকে আকাশে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে।

৪– আহমদীয়া ফিরকার মুসলমানদের বিশ্বাস সম্পর্কে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) ঘোষণা করেছেন:

"পবিত্র কুরআনের শিক্ষার বিরুদ্ধে ঈসা–মসীহ্‌কে জীবিত মনে করে কি লাভ? তাকে মরতে দাও যেন ইসলাম জিন্দা হয়।" (পুস্তক ঃ কিশতিয়ে নূহ, পৃ–২৬)।

'ক্রুশ' হলো খৃষ্ট–ধর্মের বুনিয়াদী চিহ্ন। বর্তমানে খৃষ্টানগণ ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করে –অর্থাৎ তাদের মতে পিতা–ঈশ্বর, পুত্র-ঈশ্বর (যীশু) এবং পবিত্র আত্মা। তাদের আরও বিশ্বাস হলো এই যে, হযরত আদম (আ.) ও হাওয়ার কথিত পাপ বংশানুক্রমে মানবজাতির মধ্যে প্রবাহমান রয়েছে এবং ঈশ্বর করুণাবশত: এই উত্তরাধিকার-জনিত পাপ হতে মানব জাতিকে উদ্ধারের জন্য তাঁর একমাত্র পুত্র যীশুকে প্রেরণ করেছেন, যিনি ক্রুশে জীবন দান করে মানব-জাতির আদি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গেছেন। যীশুর এই রক্তদানের মতবাদকে প্রায়শ্চিত্তবাদ বলে অভিহিত করা হয়। হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আ.) খৃষ্টানদের ত্রিত্ববাদ এবং প্রায়শ্চিত্তবাদের মুলোৎপাটন করত: অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণভাবে প্রমাণ করেছেন যে, হযরত ঈসা (আ.) ক্রুশে প্রাণত্যাগ করেন নাই–তিনি মৃত–বৎ অজ্ঞান হয়েছেন। তিনি গোপনে হিজরতের পর পরিণত বয়সে বাইবেল ও তৌরাতের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী অন্যান্য ইহুদী গোত্রের জন্য পূর্বাঞ্চলে হিযরত করত শেষ পর্যায়ে কাশ্মিরে ওফাত–প্রাপ্ত ও সমাধিস্থ হয়েছেন। এই সকল বিষয়ে উপযুক্ত প্রমাণাদি তিনি বিভিন্ন পুস্তকে উল্লেখ করেছেন এবং কলমের জিহাদের মাধ্যমে তাঁর প্রমাণগুলিকে খন্ডন করার জন্য চ্যালেঞ্জ প্রদান করেছেন। বিশেষতঃ 'মসীহ হিন্দুস্তান মেঁ', 'সিরাজুদ্দীন ঈসায়ী কি চার সাওয়ালোঁ কা জাওয়াব' 'আঞ্জামে আথাম', 'রাজে হকীকত', 'আনোয়ারুল ইসলাম', 'জঙ্গে মুকাদ্দাস, 'হুজ্জাতুল ইসলাম', 'ইজালায়ে আওহাম', 'তৌজিয়ে মারাম', 'ফতেহ ইসলাম' কিতাবুল বারিয়া প্রভৃতি পুস্তকাবলী দ্রষ্টব্য। ফলত: এই সকল প্রমাণ দ্বারা যীশুর ঈশ্বরত্ব, ত্রিত্ববাদ এবং প্রায়শ্চিত্ববাদের বিশ্বাস এবং মুসলমান পন্ডিতদের ভ্রান্ত বিশ্বাস মুলোৎপাটিত হয়েছে।

বিরুদ্ধবাদী আলেমদের ভ্রান্ত-বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত

আখেরী যুগের মুসলমানদের অধিকাংশ আলেম-উলেমা বিশ্বাস করেন যে, হযরত ঈসা (আ.) এখনও মারা যান নাই এবং তিনি আসমানে নিরাপদে সশরীরে জীবিত আছেন। এই ভ্রান্ত বিশ্বাস সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের কোন কোন উদ্ধৃতির ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়ে থাকে। এমনকি অল্প-বয়স্ক শিশু-কিশোরদের পাঠ্য-পুস্তকেও এরূপ ভ্রান্ত ধ্যান–ধারণা প্রচার করা হয়ে থাকে। এই বিষয়ের নমুনা হিসেবে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য:

"এভাবে আল্লাহতায়ালা তাঁর প্রিয় রসুল ও বান্দা হযরত ঈসা (আ.) কে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে আসমানে রাখলেন। শেষ জামানায় কিয়ামতের পূর্বে তিনি পুনরায় পৃথিবীতে আসবেন...।" *(পঞ্চম শ্রেণীর পুস্তক: "ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা", পৃ:-১৩২)*

এই ধরনের বিশ্বাস যেমন পবিত্র কুরআন ও হাদীসের প্রকৃত শিক্ষার বিরোধী তেমনি ত্রিত্ববাদী খৃষ্টান পাদ্রীদের জন্য–ইসলাম বিরোধী প্রচারণার ক্ষেত্রে মারাত্মকভাবে সাহায্যকারী যুক্তি-প্রমাণ বটে। কারণ সুদীর্ঘকাল যাবত (বর্তমানে দুই হাজার বছর) যীশু-খৃষ্টের আসমানী জীবন-যাপন এবং আখেরী যুগে পৃথিবীতে সশরীরে পুনরাগমনের ঘটনা এবং পৃথিবীব্যাপী তাঁর মাধ্যমে সর্বশেষ বিজয়াভিযান ইত্যাদি বিষয়গুলো আক্ষরিক অর্থে বিশ্বাস করা কত বড়ো মিথ্যাচার এবং বোকামী তা বলা অনাবশ্যক।

আহমদীয়া মুসলমানদের বিশ্বাসের সত্যতার প্রমাণঃ

তুলনামূলকভাবে আহমদীয়া মুসলমানদের বিশ্বাস পবিত্র কুরআন, হাদীস, এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলী দ্বারা কিভাবে সত্যায়িত এবং খৃষ্টান-পাদ্রীদের ত্রিত্ববাদী বিশ্বাসের মুলোৎপাটনকারী তা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর পুস্তকাবলী থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। এই সকল বিষয়ে আমরা এই লেখার বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোকপাত করেছি। এতদসত্ত্বেও আলোচ্যমান মত-পার্থক্য মূলক বিষয়টির কয়েকটি দিক সম্বন্ধে-প্রধানত: ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ হিসেবে দাবীকারক হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর লেখা থেকে দৃষ্টান্তমূলক কিছু উদ্ধৃতি সারাংশসহ নিচে উল্লেখ করা হলো।

“মসীহ ইবনে মরিয়ম মৃত্যুবরণ করেছেন–তিনটি পন্থা ও উপায় দ্বারা সত্যতার প্রমাণ...”

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ লিখেছেন: “আল্লাহতা'লা আমার প্রতি তাঁর বিশেষ ইলহামের মাধ্যমে প্রকাশিত করেছেন, মসীহ্-ইবনে-মরিয়ম মৃত্যুবরণ করেছেন। সেই ইলহাম বা ঐশীবাণীটি হল: “মসীহ্-ইবনে-মরিয়ম রসুলুল্লাহ্ ফওত হো চুকা হ্যায় আওর উসকে রঙ মেঁ হোকার ওয়াদা কে মওয়াফিক তু আয়া হ্যায়।” অর্থাৎ মসীহ-ইবনে-মরিয়ম রসুলুল্লাহ মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তাঁর রঙ্গেঁ রঙ্গীন হয়ে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তুমি আগমন করেছো...।” *(ইযালায়ে আওহাম”– নামক পুস্তক পৃ: ৩০২)*

অতঃপর এই পুস্তকের উপস্থাপিত বিষয়গুলো সম্বন্ধে তিনি সত্যের প্রতি জোরালো আহবান জানিয়ে বলেন ঃ “হে দর্শক! এ পুস্তকে এ অধমের ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত বিষয়বস্তু এখন সমাপ্ত হল। এতে উপস্থাপিত সার্বিক তথ্যানুসন্ধানে জানা গেল, ‘মসীহ-ইবনে মরিয়ম মৃত্যুবরণ করেছেন’-এ মর্মে আমার প্রতি অবতীর্ণ ইলহাম (ঐশীবাণী)-এর সত্যাসত্য নিরূপনের জন্য শরীয়ত বিধান মতে এবং শাস্ত্রীয় দিক দিয়ে তিনটি পন্থা ও উপায় রয়েছে: (১) কুরআন করীম, (২) পবিত্র হাদীস শাস্ত্র এবং (৩) এ উম্মতের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বুযুর্গ ইমামগণের অভিমত সম্বলিত উক্তিসমূহ। এসবগুলোর মাধ্যমেই উল্লিখিত ইলহামের সত্যতা সাব্যস্ত।” (‘ইযালায়ে আওহাম’ পুস্তক)।

(ক) হযরত মির্যা গোলাম আহমদী (আ.) বলেছেনঃ কুরআন করীমের ত্রিশটি আয়াত হযরত মসীহ-ইবনে-মরিয়ম (আ.)-এর মৃত্যু সাব্যস্ত করে। (ইযালায়ে আওহাম)।

পবিত্র কুরআনের ত্রিশটি আয়াত সম্পর্কে তিনি তাঁর বিভিন্ন পুস্তকে বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন–এই সকল আয়াতের বরাত নিচে উল্লেখ করা হলো। আলে ইমরান ১৪৫, নিসা ১৫৮–১৫৯, আলে ইমরান ৫৬, মায়েদা ৭৬, বণী ঈসরাঈল ৯৪, আহযাব ৪১, আম্বিয়া ৯, রহমান ২৭–২৮, মায়েদা ১১৮, মরিয়ম ৩২, বাকারাহ ২৫৬, নিসা ১৬০, নহল ২১, ঈয়াসীন ৬৯, রুম ৪১, বাকারাহ ১৪২, ফজর ২৮–৩১, মুমেনুন ৫১, আম্বিয়া ৩৫, নিসা ৭৯, ফাতির ৪৪, মুমেনুন ১৬, ত্বাহা ৫৬, ফুরকান ২১, মুরসালাত ২৬–২৭, ফুরকান ৮, নহল ৭১, আশরাফ ২৬, মায়েদা ১৮, দুখান ৫৭। (বিসমিল্লাহ বিশিষ্ট সুরাতের ১ নং আয়াত ধরে আয়াত নম্বর দেয়া হয়েছে।)

এই আয়াতগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা “ইযালায়ে আওহাম” পুস্তকটিতে প্রদান করা হয়েছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ:

(১) পূর্ববর্তী নবীগণ সকলই মারা গেছেন

(আলে ইমরান: ১৪৫)

“ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রসুলুন ক্বাদখালাত মিন ক্বাবলিহিররুসুল আফা ইনমাতা আও কুতিলান কালিবতুম আলা আ'ক্বাবিকুম” অর্থাৎ ‘মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কেবল একজন রসুল। তাঁর পূর্বে সকল নবী-রসূল মৃত্যুবরণ করেছেন। এখন যদি তিনিও মৃত্যুবরণ করেন বা নিহত হন, তবে তাঁর নবুওয়াতের মর্যাদাহানি হয় মনে করে তোমরা কি দীন-ইসলাম থেকে ফিরে যাবে?’ এ আয়াতের সারকথা হলো, নবীর জন্য চিরকাল জীবিত থাকা যদি জরুরী হয়ে থাকে, তবে পূর্ববর্তী নবীগণের মাঝে এমন কোন নবী পেশ কর যিনি এখন পর্যন্ত জীবিত আছেন। আর এটা স্পষ্ট যে, হযরত মসীহ (আ.) জীবিত থাকলে খোদাতা'লার উপস্থাপিত এই দলিল বা যুক্তির যথার্থতা বজায় থাকে না।

(২) হযরত ঈসা (আ.)-এর শুধু সাধারণ মৃত্যু নয়, বরং সম্মানজনক মৃত্যুর বর্ণনাঃ সূরা নিসাঃ ১৫৯

মরিয়মপুত্র ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু সাব্যস্ত করে এরূপ আরো একটি আয়াত হল: “বল রাফাআহুল-লাহু ইলাইহি” অর্থাৎ, ‘মসীহ্ ইবনে-মরিয়ম নিহত ও ক্রুশবিদ্ধ হয়ে বিতাড়িত ও অভিশপ্ত–মূলভ অপমৃত্যুতে মারা যান নি যেমন কিনা খ্রিষ্টান ও ইহুদীরা ধারণা করে থাকে। বরং খোদাতা'লা তাঁকে সসম্মানে নিজের দিকে উন্নীত করেছেন –যেমনটি প্রমাণ করে আরেকটি আয়াত: “ওয়া রাফা'নাহু মাকানান আলিইয়া”। *(সূরা মরিয়ম: ৫৮)*

এ আয়াতটি হযরত ইদ্রিস সম্পর্কে বর্ণিত। নিঃসন্দেহে এ আয়াতের এ অর্থই বটে: "আমরা তাকে মৃত্যুদানে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছি।" কেননা তিনি যদি মৃত্যু ব্যতিরেকে আকাশে উঠে গিয়ে থাকেন–তাহলে মৃত্যুর আবশ্যকীয়তার দরুন মানুষের ক্ষেত্রে যা একটি অনিবার্য ও জরুরী বিষয়–এটা মানতে হবে যে হয়তো তিনি কোন এক সময় উর্ধলোকেই মারা যাবেন নয়তো নীচে পৃথিবীতে নেমে এসে মৃত্যুবরণ করবেন। কিন্তু এ দু'টি সম্ভাবনাই একেবারে নিষিদ্ধ, অসম্ভব। কেননা, কুরআন করীম দ্বারা সাব্যস্ত যে, মাটির (জড়) দেহ মাটির দিকেই প্রত্যাবর্তন করে এবং মাটি থেকেই এর 'হাশর' (পুনরুত্থান) হবে। ইদ্রিস (আ.)-এর উর্ধারোহণ এবং আকাশ থেকে অবতীর্ণ হওয়া কুরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণিত নয়। অতএব এটি সপ্রমাণিত যে, আয়াতটিতে বর্ণিত 'রাফাঅ' শব্দটি দ্বারা এক্ষেত্রে মৃত্যু বোঝায়। কিন্তু এ রকম মৃত্যুকে বোঝায় যা শুভ ও স–সম্মানে সংঘটিত হয়ে থাকে–যেমনটি নৈকট্যপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে নির্ধারিত যে, মৃত্যুর পর তাঁদের আত্মাকে 'ইল্লিয়ীন' পর্যন্ত পৌঁছানো হয় 'ফী মাকআদি সিদক্বিন ইন্দা মালীকিন মুকতাদির [(সূরা কামর : ৫৬) অর্থাৎ, এক চিরস্থায়ী মর্যাদার আসনে, সর্বশক্তিমান অধিপতির সান্নিধ্যে" (ঐ)।

(৩) হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু আগে হয়েছে এবং পরে 'রাফা' হয়েছে... আলে ইমরান : ৫৬

'ইয়া ঈসা ইন্নি মুতাওয়াফফিকা ওয়া রাফিউকা ইলাইয়া ওয়া মুহাহহিরুকা মিনাল্লাধীনা কাফারু ওয়া জায়িয়িলুল্লাযীনাত তাবাউকা ফাওকাল্লাযীনা কাফারু ইলা ইয়াওমিল ক্বিয়ামাহ' (আলে ইমরান : ৫৬)। অর্থ : 'হে ঈসা আমি তোমাকে মৃত্যু দেব এবং তোমাকে আমার দিকে উন্নীত করব এবং যারা অস্বীকারকারী তাদের ওপর তোমার অনুসারীদেরকে প্রাধান্য দান করব। এখানে স্পষ্টত প্রকাশ পাচ্ছে যে আল্লাহতা'লা 'ইন্নি মুতাওয়াফফিকা' প্রথমে লিখেছেন এবং 'রাফিউকা' পরে বর্ণনা করেছেন। এতে করে প্রমাণিত হল যে, মৃত্যু আগে হয়েছে এবং 'রাফআ' হয়েছে মৃত্যুর পরে। এছাড়া আরও প্রমাণ হল যে, আয়াতে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীটিতে আল্লাহ্ 'জাল্লাশানুহু' (হযরত ঈসাকে সম্বোধন পূর্বক) বলেন, 'আমি তোমার মৃত্যুর পর তোমার মান্যকারীদেরকে তোমার অস্বীকারকারীদের তথা ইহুদীদের ওপর কিয়ামতকাল অবধি প্রাধান্য দান করব।' এখন এটা স্পষ্ট এবং খ্রিষ্টান ও মুসলমান সবাই স্বীকার করেন যে, উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী হযরত মসীহর পরে ইসলামধর্মের আবির্ভাব ও বিস্তারকাল যাবৎ প্রকাশ্যভাবে পূর্ণতা লাভ করেছে। কেননা খোদাতা'লা ইহুদীদেরকে ঈসা (আ.)-এর মান্যকারী খ্রিষ্টান ও মহানবী মুহাম্মদ (সা.) কে মান্যকারী মুসলমান উভয় জাতির প্রজা ও অধীনস্ত করেছেন এবং এখন পর্যন্ত সহস্র সহস্র বছর ব্যাপী তারা অধীনস্ত হয়েই চলে আসছে। এমন তো নয় যে, হযরত মসীহ্‌র অবতীর্ণ হবার পর ইহুদীরা অধীনস্ত হবে। এরকম অর্থ প্রকাশ্যভাবে ভ্রান্ত, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।" (ঐ)

(৪) পবিত্র কুরআনে কোন স্ব-বিরোধিতা নাই...

সুরা বনী ইসরাঈল : ৯৪ "আও তারক্বা ফিস–সামায়ি....কুল সুবহানা রাব্বি হাল কুনতু ইল্লা বাশরার-রাসূলা" অর্থাৎ, অস্বীকারকারীরা বলে, 'তুমি আকাশে ওঠে আমাদের দেখাও। তবেই আমরা ঈমান আনবো।' তুমি তাদের বলে দাও, 'আমার প্রভু-প্রতিপালক (এসব থেকে) পবিত্র। আমি তো কেবলমাত্র একজন মানব-রসুল।' এ আয়াতটিতে স্পষ্টত প্রতীয়মান যে, কাফিররা রসুলুল্লাহ্‌র (সা.)-এর কাছে আকাশে উত্থিত হওয়ার নিদর্শন দেখানোর দাবী জানিয়েছিল। তাদেরকে পরিষ্কার ভাষায় এ জবাব দেওয়া হয় যে, আকাশে উঠানো আল্লাহতা'লার রীতি নয়। জড়দেহসহ ইবনে–মরিয়মকে আকাশে উঠানো সঠিক বলে যদি স্বীকার করা হয় তাহলে উল্লিখিত এই জবাব অত্যন্ত আপত্তি জনক প্রতিপন্ন হবে এবং আল্লাহ পাকের কালামে স্ববিরোধিতা সাব্যস্ত হবে। অতএব সত্য ও নিশ্চিত ঘটনা এটাই যে, হযরত মসীহ (আ.) জড়দেহে আকাশে যান নি, বরং তিনি মৃত্যু বরণের পর আকাশে উত্থিত হন। ভাল কথা, আমরা ইনাদের জিজ্ঞেস করি: হযরত ইয়াহ্‌ইয়া, হযরত আদম, হযরত ইদ্রিস, হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইউসুফ প্রমুখ (আলাইহিমুস-সালাম) কি আকাশে উত্থিত হয়েছিলেন, কি হন নি? যদি তাদের উঠানো না হয়ে থাকে, তাহলে মি'রাজের রাতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কি করে তাদের সবাইকে আকাশে (অবস্থিত) দেখলেন? আর তাঁদের যদি 'রাফা' অর্থাৎ উঠানো হয়ে থাকে, তাহলে অযথা কেন হযরত মসীহ (আ.)-এর 'রাফা' অর্থাৎ উত্থিত হওয়ার অর্থ অন্য রকম করা হয়? আশ্চর্যের বিষয় যে, 'তওয়াফকি' শব্দের অর্থ যে মৃত্যু তা বিশদভাবে প্রমাণিত। তাঁর স্বপক্ষে এ অর্থটি কুরআন করীম জুড়ে বিশদভাবে বিদ্যমান। তাঁর রাফা তথা উত্থিত হওয়ার বিশদ নমুনা ও দৃষ্টান্তও দৃশ্যমান। কেননা তিনি সকল মৃত্যুবরণকারীদের মাঝে তাঁদেরই সাথে মিলিত হলেন যাঁরা তাঁর পূর্বে উত্থিত হয়েছিলেন। যদি বলেন যে, পরলোকগত হন নি–তাহলে আমি বলি যে, তারা (মারা যাবার পর) কী করে আকাশে পৌঁছলেন? তোমরা কি কুরআন করীমে এ আয়াত পাঠ কর না: **"ওয়া রাফা'নাহু মাকানান আলিইয়া"** (অর্থাৎ আল্লাহ ইদ্রিসকে 'রাফা' দান করেন তথা উচ্চ-পদমর্যাদায় উন্নীত করেন)। এটি কি সেই 'রাফা' নয়–যা হযরত মসীহর সম্পর্কেও বর্ণিত হয়েছে?" [ইযালায়ে আওহাম পুস্তক থেকে ত্রিশটি আয়াতের মধ্যে দৃষ্টান্তস্বরূপ উপরোক্ত চারটি আয়াতের অনুবাদ]। *[চলবে]*

নাস্তিকদের ধারণা সত্য নয় কেন? সৃষ্টির রহস্য উন্মোচন করে স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ

খন্দকার আজমল হক

(২য় কিস্তি)

অতএব এদের কথা মিথ্যা হতে পারে না। তাই তাদের কথা বিশ্বাসযোগ্য।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, সবাই জানেন লন্ডন নামে এক শহর আছে বা আমেরিকা নামে এক মহাদেশ আছে। যারা লন্ডন শহরে বা আমেরিকা মহাদেশে যান নি বা দেখেন নি, তারা কিসের ভিত্তিতে বিশ্বাস করেন যে, লন্ডন নামে এক শহর আছে বা আমেরিকা নামে এক মহাদেশ আছে?

অবশ্যই সবাই বলবেন যে, যারা লন্ডন বা আমেরিকা গিয়েছেন, দেখছেন তাদের সাক্ষ্যই এই বিশ্বাসের কারণ। বই পুস্তক বা পত্র পত্রিকার মাধ্যমেও তারা লন্ডন বা আমেরিকার অস্তিত্ব সম্পর্কে জেনেও এই বিশ্বাস এনে থাকেন।

তাই ঈশ্বর ও পরকাল সম্পর্কে নবী রসূল, ওলী আউলিয়াদের ও নবীদের নিকট অবতীর্ণ কিতাবের সাক্ষ্য গ্রহণে বাঁধা কোথায়?

ঈশ্বরের অস্তিত্বের আরও জোরালো প্রমাণ নিম্নে বর্ণিত হল।

বিশ্বজগৎ সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি দিলেও ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। বিশ্বজগৎ যে এমনি এমনি হয় নি সৃষ্ট বস্তুর সৃষ্ট প্রণালীই তার বড় প্রমাণ। এর কিছু নিয়ে আলোচনায় আসা যাক।

বিশ্বজগৎ সৃষ্টি কীভাবে শুরু হল, বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণার মাধ্যমে তা উদঘাটন করেছেন। তাদের এই উদঘাটিত তথ্য মানুষ বিশ্বাস করে আসছে। তারা আবিষ্কার করেছেন যে, পরিকল্পিতভাবে ধাপে ধাপে এই বিশ্বের সৃষ্টি।

তাদের মতে প্রায় ছয়শত কোটি বছর পূর্বে এর সৃষ্টির সূচনা। প্রথমে অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাশুন্যে একটি বিশাল অগ্নিপিন্ডের সৃষ্টি হয়। তার ফলে মহাশুণ্যের অন্ধকার দূরীভূত হয়। যা ঘূর্ণায়মান অবস্থায় ছিল। দীর্ঘদিন এরূপ থাকার পর এর অধিকাংশ এ হতে টুকরো টুকরো ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে এর অদৃশ্য আকর্ষণে এর চারপার্শে ঘুরতে থাকে। এগুলো দীর্ঘদিন ঘূর্ণায়মান অবস্থায় থাকার পর এগুলোর অনেকাংশ আবার অনুরূপ টুকরো টুকরো হয়ে তাদের আকর্ষণে তাদের চারদিকে ঘুরতে থাকে। এ সবই জ্বলন্ত অবস্থায় ছিল। এসব জ্বলন্ত অগ্নি পিণ্ডকে জ্যোতিষ্ক বলে। এভাবে প্রথম অগ্নিপিণ্ড হতে লক্ষ কোটি জ্যোতিষ্কের সৃষ্টি। এসব জ্যোতিষ্ক স্তম্ভ ব্যতিরেকে শুন্যে ঝুলন্ত অবস্থায় আছে। স্তম্ভ ব্যতিরেকে এদের শুন্যে অবস্থান বিস্ময়কর।

বৈজ্ঞানিকগণ জ্যোতিষ্ক সৃষ্টি সম্পর্কে এখন যা বলেছেন, বহু পূর্বেই ধর্মপুস্তক সমূহে তা বর্ণিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিকদের কথার সাথে ধর্মপুস্তকের কথা মিলে যাওয়ায় ধর্মপুস্তকের কথা যে সত্য তা প্রমাণিত হয়েছে।

বৈজ্ঞানিকগণ যেমন বলেন যে, সৃষ্টির প্রারম্ভে অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাশুন্যে এক বৃহৎ অগ্নিপিণ্ডের সৃষ্টি হয়। পরে এর অনেকাংশ খন্ড বিখন্ড হয়ে এ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরে। তেমন কুরআনও বলে "যারা অস্বীকার করেছে তারা কি দেখে না যে আকাশ সমূহ (জ্যোতিষ্ক মন্ডলি) ও পৃথিবী সংবদ্ধ (পিণ্ডাকারে) ছিল। অতঃপর আমরা তাকে চিরিয়া ফারিয়া দিলাম" (২১:৩১)। দু'কথা একই রকম হল না কি? বৈজ্ঞানিকগণ এখন যা বলছেন, চৌদ্দশত বছর পূর্বে কুরআন তা বলে রেখেছে।

এরূপ বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, প্রথমে মহাশুন্য অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। তেমন ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ তওরাতও (যা এখন বাইবেলের অংশ) একই কথা বলে। (আদি-১:২)

আবার যেমন বৈজ্ঞানিগণ বলেন যে, প্রথমে মহাশুন্যে এক বিরাট অগ্নিকুন্ডের সৃষ্টির দ্বারা তার অন্ধকার দূরীভূত হয়, তেমন তওরাতও বলে যে, মহাশুন্যের অন্ধকার দূরীভূত করার জন্য ঈশ্বর বললেন, "দীপ্ত হউক, তাহাতে দীপ্ত হইল।" (আদি- ১:২-৩)

ধর্মগ্রন্থের কথা ঈশ্বরের কথা বলে সুপরিচিত। বৈজ্ঞানিকগণ ধর্মগ্রন্থের কথাকে সত্যায়িত করায় তারা ঈশ্বরকেই সত্যায়িত করল।

ধর্মগ্রন্থের কথা যে ঈশ্বরের তা নিচের আলোচনা হতে জানা যাবে।

বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থের বর্ণনা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সব ধর্মগ্রন্থে একই বিষয়ের কথা একইভাবে বর্ণিত হয়েছে। অথচ

এদের ব্যবধান শত শত বছর। আবার এক ধর্মগ্রন্থের বর্ণনাকারীর সাথে অন্য ধর্মগ্রন্থের বর্ণনাকারীর যোগাযোগ না থাকায় একজনের কথা অন্যজন শুনে তার ধর্মগ্রন্থে সন্নিবেশ করবে, তাও সম্ভব ছিল না।

যেমন– ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ তওরাত বলে যে, বিশ্ব জগৎ ছয়দিনে (পর্যায়ে) সৃষ্টি হয়েছে। (আদি- ১:৪-৩১) তার প্রায় ২ হাজার বছর পর অবতীর্ণ কুরআনও একই কথা বলে। (৭:৫৫) যাঁর উপর কুরআন অবতীর্ণ হয় তিনি উম্মি (নিরক্ষর) ছিলেন। তাঁর পক্ষে তওরাত পড়ে তা বর্ণনা করা সম্ভব ছিল না। তৎকালে আরবে শিক্ষার পরিবেশ এমন ছিল না যে, কেউ তওরাত পড়ে তা কুরআনের বর্ণনাকারীকে জানাবেন এবং তিনি তা মুখে মুখে বর্ণনা করবেন।

এছাড়া কুরআনের বাণীসমূহ একসাথে পুস্তকাকারে লিখা হয় নি। ২৩ বছর ধরে কুরআনের বর্ণনাকারী হযরত মোহাম্মদ (সা.) মুখে মুখে (আল্লাহ্‌র কাছ হতে শুনে) সাহাবীদের যা বর্ণনা করেছিলেন, সাহাবীগণ তা হেফজ (মুখস্থ) করে রেখেছিলেন, বা কোন কাষ্ঠফলকে বা অন্য কিছুতে সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন। যা পরে একত্রিত করে হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর মৃত্যুর পর পুস্তক আকারে প্রকাশ করা হয়। তাই কুরআনের কোনো কথা তওরাতের হতে পারে না।

দু' গ্রন্থের কথা এক হওয়ায় তা'যে একই উৎস হতে অবতীর্ণ তা সহজেই বোঝা যায়। এই উৎস যে ঈশ্বর, তা আশা করি সবাই অনুধাবন করতে পেরেছেন।

অনেক বিরুদ্ধবাদীগণ বলে থাকেন যে, কুরআনের কথা হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর কথা। তিনি উম্মি বা নিরক্ষর ছিলেন। তার মুখ হতে তাৎক্ষনিকভাবে উন্নত ভাষায় বর্ণিত কুরআনের গভীর জ্ঞান পূর্ণ নির্ভুল বাণী বা ভবিষ্যতের কোনো ঘটনা বর্ণিত হতে পারে না। নিজের কথা তেইশ বছর ধরে মুখে মুখে বর্ণনা করতে হবে কেন? কারও দ্বারা এক নাগারে লিখিয়ে নিলেই তো পারতেন। কুরআনে যে সব ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ আছে তা হযরত মুহাম্মদ (সা:) করতে পারেন না। ভবিষ্যতের কথা যিনি ঘটান তিনি ছাড়া আর কেউ জানতে পারে না। অবশ্য আল্লাহ্‌ রসূলগণের মাধ্যমে ভবিষ্যতের কোন কোন বিষয় জানিয়ে থাকেন।

এসব ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়ে প্রমাণ করেছে যে, এগুলি ঈশ্বরের বাণী।

বলতে পারেন, গণকরাও তো ভবিষ্যদ্বাণী করেন। লক্ষ্য করলে দেখবেন, তাদের ভবিষ্যদ্বাণী কদাচিৎ পূর্ণ হয়, কেননা তারা অনুমান করে এসব ভবিষ্যদ্বাণী করেন।

"কুরআন ও জীবন" গ্রন্থে কুরআনী ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের বর্ণনা আছে। এরূপ বাইবেলেও অনেক ভবিষ্যদ্বাণীর বর্ণনা আছে। তাও পূর্ণ হয়েছে।

এখন পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। এর পূর্বে জ্যোতিষ্ক সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। সেখান থেকেই শুরু করা যাক।

পূর্ব বর্ণিত জ্যোতিষ্কের মধ্যে আমাদের সূর্যও একটি, যাকে নক্ষত্র বলা হয়। এই সূর্য একটি জলন্ত অগ্নিপিণ্ড যা পৃথিবী থেকে নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত এবং আকার পৃথিবীর চাইতে তের লক্ষ গুণ বেশী। সূর্য এতো বৃহৎ যে এতদূরে অবস্থান করলেও তার তাপ এত তীব্র যে এতদূর থেকেও সেই তাপে মানুষ মৃত্যুবরণ করে থাকে। সৃষ্টির বিশেষ প্রয়োজনেই এরূপ তাপের সৃষ্টি। সে কথা পরে আসছে।

বৈজ্ঞানিকদের মতে এই সূর্যও আবার কোন বৃহৎ জ্যোতিষ্কের চারদিকে তার আকর্ষণে ঘুরছে। এই ঘূর্ণনের ফলে এর আবার কয়েকটি অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে সূর্যের আকর্ষণে তার চারদিক ঘুরছে। এদের গ্রহ বলা হয়। আমাদের পৃথিবীও এরূপ একটি গ্রহ। চক্রাকারে ঘূর্ণনের ফলে এদেরও এক বা একাধিক অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে এদের চারদিকে ঘুরছে। গ্রহ থেকে উৎপন্ন বলেই এদের উপগ্রহ বলে। এরা চাঁদ নামে অভিহিত। গ্রহ সমূহের এক বা একাধিক চাঁদ আছে। কোন গ্রহে কোন চাঁদ নেই। পৃথিবীর চাঁদ মাত্র একটি। এসব উপগ্রহ সমূহ গ্রহের ন্যায় চক্রাকারে না ঘুরে গ্রহের দিকে মুখ করে একইভাবে ঘুরছে। গ্রহ উপগ্রহ সহ সকল জ্যোতিষ্ক এক অদৃশ্য আকর্ষণের দ্বারা নিজেদের নিরাপত্তা দিয়ে আসছে। কোন নিয়ন্ত্রক ছাড়া কি এভাবে মহাকাশে লক্ষ কোটি বিভিন্ন প্রকারের জ্যোতিষ্ক নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছে? কারো সাথে কারো কোনো সংঘর্ষ নেই, কোন বিশ্রাম নেই। সেই আদিকাল হতে প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষ পথে সুনির্দিষ্টভাবে ঘুরছে। এদের অবশ্যই নিয়ন্ত্রক থাকতে হবে। নাস্তিক ভাইয়েরা চিন্তা করে দেখবেন কি?

ক্রমে ক্রমে গ্রহ উপগ্রহ সমূহ ঠান্ডা হয়ে মৃত্তিকা রূপ ধারণ করে। লক্ষ্যনীয়, এ গ্রহ, উপগ্রহ সূর্য হতে সৃষ্টি হলেও সূর্য তার নিজস্বরূপ নিয়ে আছে। এটা যে উদ্দেশ্যমূলক তা পৃথিবীর পরবর্তী সৃষ্টি সমূহের আলোচনা হতে বোঝা যাবে। দেখা যাবে যে, পৃথিবীর সৃষ্ট বস্তুর প্রয়োজনে সূর্যকে তার নিজস্বরূপে রাখা হয়েছে।

পৃথিবী মাটির রূপ ধারণ করার পর তাতে সাগর-মহাসাগর, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষ-লতা প্রভৃতি সৃষ্টি করা হয়। অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ মাটির রূপ ধারণ করলেও সেগুলোতে পৃথিবীর সৃষ্ট বস্তুর ন্যায় কোন কিছু এখন পর্যন্ত আবিষ্কার হয় নি। এগুলো অবশ্য বিনা কারণে সৃষ্টি হয় নি। একটি কারণ মনে হয় যেহেতু এদের নিজস্ব কোনো আলো নেই। সূর্যের আলোতে এ সকল গ্রহ, উপগ্রহ আলোকিত হয়। সূর্যের আলো এসব গ্রহ উপগ্রহে প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীর উপর পড়ে তাকে আলোকিত করে। এটাও লক্ষ্যনীয়, গ্রহসমূহের আলো অন্যান্য জ্যোতিষ্ক বা তারার আলো হতে উজ্জ্বল। তাই এর আলো পৃথিবীকেও আলোকিত করে। হয়তো স্রষ্টা পৃথিবীকেই মানুষসহ সকল প্রাণীর বসবাসের স্থান নির্বাচন করবেন বলেই পৃথিবীকে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর বাসবাস উপাযোগী করে সৃষ্টি করা হয়েছে।

ধাপে ধাপে জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড হতে জ্বলন্ত পৃথিবী, জ্বলন্ত পৃথিবী হতে মাটির পৃথিবী, মাটির পৃথিবীকে মানুষের বসবাস উপাযোগী করা নিশ্চয় বিনা উদ্দেশ্যে হয় নি। কী সেই উদ্দেশ্য।

বিশ্বের সৃষ্টি সমূহের প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, প্রাণীকূলের মধ্যে মানুষকেই সর্বশেষে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানবসৃষ্টির পূর্বে যা কিছু সৃষ্টি করা হয় সবই তার প্রয়োজনে লাগে। এতে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, মানুষকে সৃষ্টি করা হবে বলেই তার সৃষ্টির পূর্বে তার প্রয়োজনীয় সব কিছু তার ভবিষ্যৎ বাসস্থানে মজুদ রাখা হয়, যাতে তাকে কোন অসুবিধা ভোগ করতে না হয়।

কাল বা প্রকৃতি কি এমন কোনো সত্ত্বা যা ভবিষ্যতে মানুষ সৃষ্টি করা হবে চিন্তা করে তার সৃষ্টির পূর্বেই তার প্রয়োজনীয় সামগ্রী সমূহ তার আগামী বাসস্থানে প্রস্তুত করে রাখবে? বরং জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন কোনো বাস্তব সত্ত্বাই ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এসব বস্তু সৃষ্টি করতে পারে।

মানবসৃষ্টির পূর্বে যেসব বস্তু সৃষ্টি হয়েছিল তা কীভাবে মানুষের কাজে ব্যবহৃত হয় এখন তার উপর আলোকপাত করছি। স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণের জন্যই এই আলোচনা।

মানুষ এমন একটি প্রাণী যার বসবাসের জন্য কোনো শক্ত অবস্থান চাই। এজন্যই মাটির পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়। অন্য জীব জন্তুর জন্যও মাটিরূপ কোনো শক্ত অবস্থানের প্রয়োজন। এ মাটি এমন যে তাতে বৃক্ষ লতাও জন্মাতে পারে। এসব কথা চিন্তা করেই মাটির পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়।

যে জ্যোতিষ্কমালা সৃষ্টি করা হয়েছে তাও মানুষের জন্য। কারণ যে পৃথিবী মানুষের অবস্থানস্থল তা জ্যোতিষ্কমালা হতেই সৃষ্ট। এ জ্যোতিষ্ক মালার একের প্রতি অপরের আকর্ষণেই পৃথিবী টিকে আছে। অর্থাৎ জ্যোতিষ্কমালা পৃথিবীর নিরাপত্তা বিধান করে। এরূপ চন্দ্র-সূর্য, সাগর-মহাসাগর, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষ-লতা প্রভৃতি মানুষের কাজে ব্যবহৃত হয়। এসবই মানুষের সেবা করে যাচ্ছে।

প্রথমে সূর্য নিয়ে আলোচনা করা যাক।

সূর্যরশ্মি আলো ও তাপ বিকিরণ করে। এই আলো ও তাপ মানুষসহ সকল প্রাণী এমনকি বৃক্ষ লতার জন্য অপরিহার্য। সূর্যের আলো ও তাপ না হলে প্রাণী কুল বা বৃক্ষলতারা বাঁচত না। প্রথমে সূর্যের আলো নিয়ে আলোচনা করা যাচ্ছে। পরে তাপ নিয়ে আলোচনা করা যাবে।

সূর্যের আলো দ্বারা দিন রাত্রির সৃষ্টি। তা হয়তো সবাই জানেন। এই দিন রাত্রির সৃষ্টি বৈচিত্র নিয়ে কেউ চিন্তা করেন কি? পৃথিবীকে এমন অবস্থায় রাখা হয়েছে যে তাতে দিন রাত্রির সৃষ্টি হয়। এই দিন রাত্রি সৃষ্টির কৌশল এমনি এমনি কি সম্ভব? দিন-রাত্রির সৃষ্টি কৌশল নিয়ে আলোচনা করা আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

পৃথিবী সহ সব গ্রহ সূর্যের চারদিকে নিজ নিজ কক্ষপথে নিজ নিজ অক্ষের উপর লাটিমের মতো চক্রাকারে ঘুরছে। এর ফলে কোনো সময় তার কোনো অংশ সূর্যের সামনে আসে, সে অংশে সূর্যের আলো পড়ে আলোকিত হয়। এই আলোকিত অংশকে দিন বলে। আর কোন সময় তার কোন অংশ সূর্যের সামনে আসে না। এজন্য সে অংশে সূর্যের আলো পড়ে না। সে অংশ অন্ধকার থাকে। এই অন্ধকার অংশকে রাত্রি বলে। এভাবে দিন রাত্রির সৃষ্টি।

এখন দিন রাত্রির সৃষ্টি কেন তা জানা যাক। দিন রাত্রি পর্যায়ক্রমে আসার জন্য দিনের আলোতে মানুষ জীবিকা নির্বাহের জন্য বিভিন্ন প্রকার কাজ করে থাকে। মানুষ দিনের বেলায় শিক্ষা লাভসহ অন্যান্য দৈনন্দিন কাজও করে থাকে।

রাত্রের অন্ধকারে মানুষ কোনো কাজ করতে পারে না। মানুষ দিনের বেলা কাজের জন্য যে ক্লান্তি অনুভব করে, তা দূর করার জন্য রাত্রে বিশ্রাম গ্রহণ করে। ঘুমের মাধ্যমে দিনের ক্লান্তি দূর করা হয়। রাত্রে বিশ্বও ঘুমে আচ্ছন্ন থাকে। নিরব নিস্তব্ধ রাতে মানুষ শান্তিতে ঘুমিয়ে দিনের ক্লান্তি দূর করে। দিন রাত্রির আবশ্যকতা সম্পর্কে কারও অজানা নেই। মানুষ যেমন দিনের আলোয় কাজ করে, নিশাচর পাখি ছাড়া সব পাখি দিনে খাদ্যের অন্বেষণে চড়ে বেড়ায় ও রাত্রে তারাও নিজ নিজ নীরে বিশ্রাম নেয়। স্রষ্টা এসব চিন্তা করেই দিন রাত্রির সৃষ্টি করেছেন। এভাবে দিন রাত্রির সৃষ্টি কালের প্রভাবে হতে পারে না। *(চলবে)*

[এ লেখাটিতে বর্ণিত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লেখকের একান্ত নিজস্ব– সম্পাদক]

এলান

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।
আগামী ২০ ও ২১ ডিসেম্বর ২০১৯ রোজ শুক্র ও শনিবার ২ দিন ব্যাপি কেন্দ্রীয় ওয়াকফে নও ইজতেমা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, ইনশা'ল্লাহ। উক্ত ইজতেমায় ১০ বছর উর্দ্ধ সকল ওয়াকফে নও ছেলে ও মেয়েদের উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ইজতেমায় আসার সময় করণীয় কাজ নিম্নে দেয়া হল:

- ছেলেদের- সাদা শার্ট, কালো প্যান্ট ও কালো টুপি এবং মেয়েদের- সাদা পোশাক ও সাদা স্কার্ফ সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।
- ১৯ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ রাতের মধ্যে কেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে।
- ২০ তারিখ বা'দ ফজর থেকে প্রোগ্রাম শুরু হবে।
- ওয়াকফে নও নম্বর সাথে করে নিয়ে আসবেন।

আবুল আতা মামুন
নাযেমে আলা, কেন্দ্রীয় ওয়াকফে নও ইজতেমা-২০১৯
মোবাইল: ০১৬১৮ ৩০০ ১০০

'ইমাম আখেরুজ্জামান'-এর সতর্কবাণী–

হে এশিয়া তুমিও নিরাপদ নহ
হে ইউরোপ তুমিও নিরাপদ নহ

কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

খোদার অস্তিত্বকে মানুষ এখন যেভাবে ভাবেন–

(এক) খোদার কোন অস্তিত্ব নেই। এমনটি ভাবারও দরকার নেই। প্রাকৃতিক বিধানানুসারে পৃথিবী চলছে, চলবে (নাস্তিক)।

(দুই) হয়ত খোদা বলতে কেউ আছেন, তাঁর সম্বন্ধে এতটা গুরুত্বের সাথে ভাবার দরকার নেই (সন্দেহপরায়ণ আস্তিক)।

(তিন) খোদা আছেন তবে তাঁর ক্ষমতার প্রভাব পৃথিবীতে এখন সবল নহে (খোদাতে আস্তা সম্পর্কে দুর্বল ধারণার আস্তিক)।

(চার) খোদা তো আছেন বটে তবে, "জান বাঁচানো ফরয"। সুতরাং জান বাঁচানোর প্রয়োজনে মিথ্যা বলা না জায়েয নয় (খোদার অস্তিত্বে আস্তিক তবে খোদা সর্বশক্তিমান নহে)।

(পাঁচ) খোদা আছেন তবে কথা বলেন না। ওহীর দরোয়াজা বন্ধ (বাকহীন খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাসী)

(ছয়) খোদা থাকুক কিংবা না থাকুক তা গুরুত্বের সাথে ভাবার প্রয়োজন নেই। আমি ভাল হয়ে চললেই হলো। আপাতত: যা ইচ্ছা করি পরবর্তী সময়ে পুণ্যতা অর্জনে সবকিছু ক্ষমা করিয়ে নিব (খোদার অস্তিত্বে গুরুত্বহীন আস্তিক)।

(সাত) আবার কেউ আছেন ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী। খোদা তিনজন (খোদার অস্তিত্বে ভয়ঙ্কর বিশ্বাসী)

খোদার অস্তিত্বে আরো বহুবিধ বিশ্বাসী আজকের পৃথিবীতে বিদ্যমান। যেমন ধরুন– কবর পূজারী, পীর পূজারী ফকীর পূজারী, প্রতিভা পূজারী, গুরু-দরবেশ ঋষি পূজারী, সম্পদ পূজারী, সাঝ-সকাল প্রহর পূজারী এমনি রকম-সকম বহু ধরণের খোদা বিশ্বাসী আজ পৃথিবীর সবদেশের সর্বত্র বিরাজমান। সর্বশক্তিমান লা-শারিক খোদাতে সর্বসাকুল্য বিশ্বাসী মানব আজ নাই বলেই মন্তব্য করা যায়। খোদা আছেন, হয়ত তিনি কখনো কারোর ডাক শুনেন হয়ত বা আমাদের দেখেন এমন দুটানা বিশ্বাস প্রত্যেক মানবান্তরে। তিনি আছেন আর আমাদের জন্য যদি তিনি থেকেই থাকেন তবে মানব সমাজে এমন সব ভয়ঙ্কর অপকর্ম কেন? ইত্যাদি প্রশ্ন অন্তরে উত্থাপন করে মানুষ খোদার অস্তিত্ব সম্পর্কে নিরব। কোন মানুষই প্রবল-পরাক্রম শক্তিতে খোদাকে উপস্থাপন করার সাহসও পাচ্ছে না, জ্ঞানেও সমর্থ হচ্ছে না। আপাততঃ সবাই পীর ফকির কিংবা গুরু ঘাড়ে দায়িত্বার্পণ করে ঐহিক জীবনে প্রশান্তিতেই আছেন। মৃত্যোত্তর আত্মার মুক্তি কামনারও সুদৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করছেন। এমন অবস্থার প্রেক্ষিতে পূর্ণ আস্তিকের জন্য অবশ্যই সন্তাপের কারণ।

মানুষের মধ্যে যেকিনা তার চিন্তা-চেতনা, বুদ্ধি-জ্ঞান, চেষ্টা-প্রচেষ্টার দ্বারা যতদিন পর্যন্ত সর্বশক্তির আধার জীবন্ত খোদাকে আবিষ্কার করতে ও স্বীয় চৈতন্যে উপস্থাপনে সক্ষম হবে না সে মানুষ, মানুষই নহে, নিকৃষ্ট কীট। সে মানুষ উত্তম নহে সর্বাধম। এখানে হযরত হাসান বসরী (রহ.)-এর একটি উপদেশবাণী প্রণিধান যোগ্য। তিনি খোদাকে কীভাবে মূল্যায়ণ করেছেন, তাঁর স্নেহ-মমত্বে কী ধরণের বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁর সেই উক্তির দ্বারা খোদার অস্তিত্ব কত মহত্বে উপস্থাপিত হয়েছে তা উপরুল্লোখিত উদাসীন বিশ্বাসীদের আমলে আনা উচিত। এর দ্বারা খোদার ওপর তথাকথিত বিশ্বাসীদের বিবেক জাগ্রত হবে বৈ কী? তিনি (রহ.) সেদিন একটি কুকুরকে সামনে দেখে মন্তব্য করেন, "ওহে মাবুদ! পরকালে কী আমি এই কুকুরটির সাথে হাশর করতে পারব"? তার ভাষ্য শ্রবণে তাঁর পাশে থাকা এক লোক বলল, "হুযূর! এ কুকুরটি কী আপনার চেয়ে উত্তম না আপনি এর চেয়ে উত্তম? জবাবে হাসান রহমতুল্লাহে আলায়হে বললেন, "রোজ কিয়ামতের দিন যদি আমি পাপ পুণ্যের বিচারে মুক্তি লাভ করতে পারি তা হলে নিজেকে আমি কুকুরটির অপেক্ষা উত্তম বলতে পারি। আর যদি আমি মুক্তি লাভ করতে সমর্থ না হই তাহলে কুকুরটি আমার অপেক্ষা ঢের উত্তম" (তাযকেরাতুল আউলিয়া)। খোদার অস্তিত্বে ও তাঁর শক্তিতে তিনি (রহ.) কতবড় মাপের বিশ্বাসী ছিলেন তা এই উক্তিতে প্রকটরূপে প্রতিভাত হয়। তিনি খোদার অস্তিত্বে কেবল বিশ্বাসীই ছিলেন না বরং ছিলেন অতুলনীয় তাক্ওয়াপরায়ণ ও অসাধারণ খোদাপ্রেমী এমন মহান বিশ্বাসের আদলে খোদার অস্তিত্বকে

উপস্থাপন করাই হলো খোদার সৃষ্ট মানুষের দায়িত্ব। এরই নাম সর্বেসর্বা 'হুকুকুল্লাহ'। এর ব্যতিক্রম ঘটলেই মানুষের জন্য দুর্ভোগ নিশ্চিত। খোদার ক্রোধাগ্নি এমন নড়বড়ে বিশ্বাসী মানুষকে প্রজ্জ্বলীত না করে ছাড়বেন না। খোদার অস্তিত্বে ভাসা ভাসা বিশ্বাস আর সাথে পীর পূজা, এমন দুটানা দুর্মুখগণ কদাচ পরিত্রাণ লাভের আশা করতে পারেন না। খোদা আছেন এবং তাঁর অস্তিত্বে অটল বিশ্বাসে জীবন বিনিময়ে অনড় থাকতে হবে। যেমনটি ছিলেন শাহেবজাদা হযরত আব্দুল লতিফ সাহেব (রা.)। সমস্ত আফগান ও সে দেশের সর্বোচ্চ প্রশাসন বলেছিল, "হে সাহেবজাদা সাহেব! আপনি আফগানের একজন উচ্চ পর্যায়ের মর্যাদাবান ব্যক্তি। আপনি কানে কানে শুধু একবার বলুন যে, আপনি এ বিশ্বাসে বিশ্বাসী নন, তা হলেই আপনি প্রাণে বেঁচে যাচ্ছেন।" কিন্তু খোদাতে অটল-অবিচল বিশ্বাসী সেই ব্যক্তিত্ব কঠিন আত্মা জবাবে বললেন, "না, তা কক্ষণো হবার নয়। আমি যে সত্যে স্বীকৃতি দিয়েছি তা থেকে আমি এক পদও পিছনে আসতে পারি না। আমি আমার প্রাণ ও বিশ্বাসকে দুভাগে ভাগ করে ফেলেছি। আমার কাছে আমার প্রাণ ততটা আপন নয় যতটা আপন, আমার বিশ্বাস। এক্ষণে তা-ই ঘটুক যা আপনাদের সিদ্ধান্তে রয়েছে"। সে যৎপরোনাস্তি সত্য সাধক জীবন্ত খোদার অস্তিত্ব প্রমাণের স্বার্থে জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে মৃত্যুকে আলীঙ্গন করলেন। মরণকে বরণ করে অমর হয়ে রইলেন শহীদী খেতাবে। আর সত্যকে স্বর্গীয় মর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসীন করলেন। সুতরাং হে খোদার অস্তিত্ব সম্পর্কে দুটানা বিশ্বাসীগণ! সাবধান! খোদা "হয় আছেন" না বলে বরং বলুন, খোদাতেই আমাদের প্রাণ সমর্পিত। খোদাই আমাদের আনন্দ খোদাই আমাদের সম্পদ। যেমনটি এ যুগের মাহদী (আ.) যিনি খোদাকে সাথে করে খোদারই পৃথিবীতে খোদাকে উপস্থাপন করেছেন।

তিনি (আ.) তাঁর খোদার অস্তিত্ব ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, 'আমাদের প্রথম ও প্রধান বিশ্বাসই হলো, আমাদের এক কাদের, কাইউম ও খালেকউল কুল খোদা আছেন, যাঁর গুণাবলী অনাদি-অনন্ত এবং অপরিবর্তনীয়। তিনি এক এবং তার জ্যোতির বিকাশ বিভিন্ন। তিনি পরম ও চরম গুণের অধিকারী। কিন্তু সন্তাপ যে, জগদ্বাসী তাদের সম্পদের ওপর সেই খোদাকে স্থান দেয় না। পরন্তু আমরা সকল সফলতা ও বিফলতা সর্বাবস্থায়ই আমাদের সমস্ত তাঁর দ্বারে অবনত রাখি।' তিনি (আ.) আরো বলেন, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া কোন সৃষ্ট জীবের পূজা করবে না। তোমাদের এই খোদা তোমাদের এক প্রিয় সম্পদ তোমরা নিষ্ঠার সাথে তাঁর সমাদর কর। প্রত্যেক পদে পদে তিনিই তোমাদের সহায়। তিনি ব্যতীত তোমরা কোন কিছুই নহ। তোমাদের পার্থিব উপকরণ এবং প্রচেষ্টা কিছুই নহে। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকে এই প্রস্রবনের দিকে ধাবিত হও। কেননা ইহাই জীবনের উৎস। আমি কি করব এবং কি উপায়ে এ সুসংবাদ তোমাদের হৃদয়ঙ্গম করাবো। মানুষের শ্রুতিগোচর করার জন্য কোন জয় ঢাক-ঢোল পিটিয়ে আমি বাজারে-বন্দরে ঘোষণা করব যে, 'ইনিই তোমাদের খোদা'। এরূপ খোদার আঁচল ছেড়ে দেয়া নির্ব্যূঢ় নির্বুদ্ধিতার কাজ" (পুস্তক, কিশতিয়ে নূহ)।

যুগ-ইমাম মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) কতই না কাতর কণ্ঠে জীবন্ত খোদা ও তাঁর পরিচয়কে উপস্থাপন করেছেন যা প্রণিধান যোগ্য। তাক্ওয়াপরায়ণ ব্যক্তিগণের জন্য সুমহান এই উক্তি সমূহ আলোকবর্তিকা স্বরূপ যা অনুসরণে ঐ অন্বেষণেরা খোদা সমীপ্যে পৌঁছতে সামর্থ্য লাভ করবে। মানুষের জন্য আক্ষেপ, যে খোদা মানুষের সবচেয়ে সন্নিকট, ডাক দিবামাত্রই যে খোদা আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দেন, সাগরের অতল তল থেকে ডাক দিলেও যে খোদা শ্রবণ করেন, গহীন জঙ্গলের অন্ধকার হতে ডাকলেও যে খোদা উত্তর দান করেন, যেখান থেকে ডাকলে তার আওয়াজ কোন মানুষের কানে পৌঁছায় না। সেখান থেকে ডাকলেও যিনি তাঁর প্রিয়ের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন এহেন প্রেমাধার অনুকম্পাপরায়ণ খোদার অস্তিত্বকে কিনা মানুষ অনুমানের ভিত্তিতে বিশ্বাস করে। অভিশাপ জাগতিক সেসব ব্যুৎপত্তি লাভে গর্বিত অকর্মদেরকে যারা কিনা বলেন, 'হয়ত বা খোদা আছেন'। হায়! শত আফসোস, অতি বুদ্ধি মানুষকে অতি বিপথগামী করছে।

পক্ষান্তরে খোদা অতি সোহাগ ও সাদরে বলেন, "এবং যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্পর্কে (হে রসূল) তোমাকে প্রশ্ন করে, তখন (তুমি বল) আমি (তাদের) খুবই কাছে আছি আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার জবাব দেই যখন সে আমার কাছে প্রার্থনা করে। সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার ওপর ঈমান আনে যাতে করে তারা সঠিক পথ পায় (২:১৮৭)। খোদার স্নেহাদরের কথা বলতে গিয়ে তাঁর রসূল (সা.) বলেন, খোদা এমন এক প্রেমাধার যাঁর প্রেম প্রত্যাশায় এক বিগত এগুলে খোদা তাঁর দিকে দুই বিগত এগিয়ে আসেন। বান্দা তাঁর দিকে হেঁটে আসলে তিনি বান্দার দিকে দৌড়ে আসেন, এক বাহু বাড়িয়ে দিলে তিনি দুই বাহু বাড়িয়ে তাকে জড়িয়ে ধরেন। সুতরাং এমন বাৎসল্যপরায়ণ খোদার অস্তিত্বে আমরা কী করে উদাসীন হতে পারি? এমন অস্তিত্ববান সত্তাকে আমরা কী করে সাধারণ বিষয় বলে জ্ঞান করতে পারি?

অতএব প্রেক্ষিতেই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সতর্কবাণী,

হে এশিয়া! তুমিও নিরাপদ নহ,
হে ইউরোপ! তুমিও নিরাপদ নহ,

হে দ্বীপবাসীগণ! কোন কল্পিত খোদা তোমাদেরকে রক্ষা করবে না। এশিয়া ইউরোপ আর আফ্রিকা আমেরিকা পৃথিবীর সকল দেশের সকলকে সাদরে-আদরে সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি আপনারা খোদার অস্তিত্বের ব্যাপারে এবং বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুনিচয়ে তাঁর

প্রবলপরাক্রম প্রভাব বিদ্যমান থাকার নিশ্চয়তায় আপনাদের কল্পনাপ্রসূত ধারণাকে সর্বৈব পরিত্যাগ করুন। যিন্দা খোদার অস্তিত্বে নিঃসন্দেহে বিশ্বাসী খোদার প্রতিনিধি যুগের মাহদী (আ.) বলেছেন, "হে বন্ধুগণ! তোমাদের এই ঘৃণ্য বিশ্বাস তোমাদেরকে সমূলে বিনাশ করবে। খোদাকে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান কর। নিশ্চয় সে ইতর ও পাপিষ্ঠ যে কিনা তাঁর অনুগ্রহরাজীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। সর্বাবস্থায় তাঁর উপস্থিতি বিরাজমান পরম এ সত্যে বিশ্বাসপরায়ণ হও। সকল প্রকার প্রাপ্তি মহানুভব খোদার পক্ষ হতে প্রাপ্ত নয়, এমন জঘন্য ধারণাকে সর্ভূত পরিহার করতঃ খোদার একত্ব ও সর্বশক্তির আধার এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হও। নচেৎ খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর। তাঁর সম্মুখে বহু অন্যায় অনুষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। এতদিন তিনি তা নিরবে সহ্য করেছেন। এবার তিনি রুদ্র মূর্তিতে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করবেন। পরিণামে সবার নির্মিত ভঙ্গুর সংসার ভয়ঙ্করভাবে বিপদগ্রস্থ হবে। তখন সকাতরে সবায় বলবে, "হায়! পৃথিবীতে আজ কী হতে চললো"।

সুতরাং তোমাদের প্রতি অধমের সবিশেষ অনুরোধ যে, "খোদাকে কেবল খোদার সাহায্যেই চেনার চেষ্টা কর পাওয়ার চেষ্টা কর। কোন ষড়যন্ত্র, ধূর্ততা, পরিকল্পনা ও কৌশল দ্বারা তাঁর সন্ধান লাভ সম্ভব নয়। আলোকিত হৃদয় জানে যে, খোদার সন্ধান মানব প্রকৃতির আবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য। মানব হৃদয় খোদা ছাড়া কোনভাবেই স্বস্তি লাভ করতে পারে না। আদি থেকে মানব প্রকৃতি এমনই চলে আসছে। প্রতিটি মানুষের আত্মার খোরাক মূলত এটাই।" (পুস্তক বারাহীনে আহমদীয়া, ৩য় খন্ড)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা "পাক্ষিক আহমদী" পত্রিকার সম্মানিত গ্রাহকগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর শেষ হয়ে গিয়েছে। গ্রাহকগণের অনেকেরই গত বছরের গ্রাহক চাঁদা বাকী রয়ে গিয়েছে। ইতোমধ্যে নতুন অর্থ বছর শুরু হয়েছে। তাই অনুগ্রহ পূর্বক প্রত্যেকে গত বছরের বকেয়া গ্রাহক চাঁদা (প্রতি বছর ২৫০/- টাকা হারে) পরিশোধ করে বাধিত করবেন। পাক্ষিক আহমদী সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পেতে যোগাযোগ করুন: ফারুক আহমদ বুলবুল, সহকারী লাইব্রেরীয়ান, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ।

মোবাইল নং- ০১৭৩৬১২৪৭০৪, ০১৯১২৭২৪৭৬৯

ওয়াসসালাম

খাকসার

সেক্রেটারী ইশায়াত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

কবিতা

প্রশংসা

শাহ হকিব উদ্দিন

চিরজীবী, চিরস্থায়ী, চির মহান প্রভু,
তোমার আলো বাতাস,
বৃষ্টি-বায়ুতে জুড়ায় প্রাণ,
তোমায় ভুলা যায় না কভু।

রহমান তুমি, মালিক তুমি,
বিচার দিবসের প্রভু,
তোমাকে ছাড়া ব্যর্থ জীবন,
তোমাকে ভুলব না কভু।

দিব্যদর্শনে জাগ্রত কর,
অন্ধকারে দাও আলো,
সর্বজ্ঞানে জ্ঞানী তুমি,
সর্বজ্ঞানে ভাল।

বিশ্ব ভূবনের মাঝে তোমারি মহিমা সাজে,
তোমারি তৌহিদের বাণী,
সকল ধর্মের ওপর বিজয়ী করেছ,
দিয়েছ পবিত্র কুরআন খানি।

অন্ধকার কুসংস্কারে নিমজ্জিত,
যখন মানব জাতি,
অপূর্ব কুরআনের আলো ছড়িয়ে দিলে,
বিশ্বে পরিপাটী।

স্রষ্টা তুমি, পালক তুমি,
তুমিই রহমান,
অযাচিত অসীম দাতা;
তুমি চির মহান।

জাগতিক চক্ষুর অন্তরালে,
রেখেছে তোমার শান,
ইমাম মাহ্‌দীকে পাঠিয়ে মোদের,
সাধিলে পরিত্রাণ।

সংবাদ

সংকলন: মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের ৪৮তম জাতীয় ইজতেমা সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত

জাতীয় ও সংগঠনের পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের ৪৮তম জাতীয় বার্ষিক ইজতেমার শুভ উদ্বোধন করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের সদর জনাব মুনাদিল ফাহাদ এবং ইজতেমার নাযেম আলা জনাব মাহবুবুর রহমান জেপি। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঢাকার দারুত তবলীগ মসজিদ প্রাঙ্গনে ৪ অক্টোবর শুক্রবার সকাল ৭:০০ মিনিটে ইজতেমার উদ্বোধন করা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব এবং মজলিসের পতাকা উত্তোলন করেন সদর, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ। পতাকা উত্তোলনপর্ব শেষে দোয়া পরিচালনা করেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব। এরপর উদ্বোধনী অধিবেশনে ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর জনাব মুনাদিল ফাহাদ এবং ইজতেমার নাযেম আলা জনাব মাহাবুবুর রহমান জেপী বক্তব্য রাখেন। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন চট্টগ্রাম মজলিসের খাদেম জনাব হাসান মোহাম্মদ মিনহাজুর রহমান এবং নযম পাঠ করেন আহমদনগর মজলিসের জনাব জুবায়ের আহমদ রিয়াদ। এরপর স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইজতেমার নাযেম আলা জনাব মাহবুবুর রহমান জেপী। তিনি তার বক্তৃতায় ইজতেমায় আগত সকলকে নসীহত করেন যে, তারা যেন খেলাধূলা সহ সব বিষয়ে উন্নত আদর্শ স্থাপন করেন। ইজতেমায় অংশগ্রহণকারী সবাই যেন সঠিক সময়ে বাজামাত নামায আদায় করেন এবং সব প্রোগ্রামে অংশ নেন এ বিষয়ে বিশেষ তাগিদ প্রদান করেন।

এ পর্যায়ে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব ঈমান উদ্দীপক বক্তব্য প্রদান করেন যা ইজতেমায় আগত সকল সদস্যগণকে বিশেষভাবে উজ্জীবিত করে। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি পবিত্র কুরআন চর্চা, কুরআন শুদ্ধ ও বুঝে পড়া এবং উপলব্ধি করার প্রতি সকলের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সেই সাথে পবিত্র কুরআনের কোন স্থানে আমীন বলতে হবে আবার কোন স্থানে আস্তাগফিরুল্লা বলতে হয় আর কোন স্থানে আলহামদুলিল্লাহ বলা অর্থাৎ পবিত্র কুরআন পাঠের সময় কোন স্থানে কোন উত্তর দিতে হবে সে বিষয়েও সবাইকে অবগত করেন। এছাড়া তিনি তার বক্তৃতায় আরো বলেন– আহমদী যুবকরা যেন স্মার্ট ফোন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে না পড়েন বরং শরীর চর্চা ও বিভিন্ন খেলাধূলায়ও সময় কাটান। এতে নিজের শরীর ও মন উভয় ভালো থাকবে আর এর ফলে ধর্মের সেবা করারও দীর্ঘ সময় পাওয়া যাবে। কেননা ধর্মের সেবার জন্য সুস্থ থাকা চাই। শেষে তিনি বলেন– কেউ যদি সম্মানিত হতে চায় সে যেন পবিত্র কুরআনের আলোয় আলোকিত হয়।

উদ্বোধনী অধিবেশনের এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখেন মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ-এর সদর জনাব মুনাদিল ফাহাদ। তিনি ইজতেমা উপলক্ষে আগত সকলকে স্বাগত জানিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি তার বক্তৃতা নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের খোদ্দামুল

আহমদীয়ার ইজতেমায় যে বক্তৃতা করেন তার আলোকে বলেন– আমাদেরকে নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করতে হবে। তিনি বলেন- আমাদের ইজতেমা যেন ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে আরো সুদৃঢ় করে। আমাদের ইজতেমা যেন এই স্বাক্ষ্য দেয় যে, ধর্মের সেবার জন্য যে কোন কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে আমরা প্রস্তুত রয়েছি। শেষে তিনি সকলকে আহ্বান করে বলেন– আমাদের প্রত্যেকের উচিত নিজের উত্তম আদর্শ স্থাপন করা। মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে উদ্বোধনী অধিবেশনের সমাপ্তি হয়। এরপর ইজতেমার বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে হতে থাকে।

৪ অক্টোবর সন্ধ্যা ৭টায় কারিগরি শিক্ষার গুরুত্বের ওপর বক্তব্য রাখেন ড. আব্দুল্লাহ শামস বিন তারেক। সন্ধ্যা ৮টায় তরবিয়তী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ধর্মের সেবার বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান। উক্ত সভায় মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের সদর জনাব মুনাদিল ফাহাদ উপস্থিত ছিলেন। সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে পাঠ করেন চট্টগ্রাম মজলিসের খাদেম জনাব ইমরান সাঈদ আকাশ এবং নযম পাঠ করেন মিরপুর মজলিসের খাদেম জনাব রাহুল আলী। এরপর 'ইজলাসে আম্মা' অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের সদর জনাব মুনাদিল ফাহাদ। বাৎসরিক রিপোর্ট উপস্থাপন করেন মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের মোতামাদ ডা. এনামুর রহমান সাদাফ। শেষে সদর সাহেব মজলিসের আহাদ নামা পাঠ করান ও দোয়া পরিচালনা করেন।

৫ অক্টোবর সন্ধ্যা ৭টায় ক্যারিয়ার গাইড লাইন বিষয়ক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের সম্মানিত চেয়ারম্যান ও সিইও জনাব আহসান খান চৌধুরী বক্তব্য রাখেন। এছাড়া কর্মক্ষেত্রে যারা সফল হয়েছেন এমন কয়েকজন যুবক তাদের সফলতার কথাও ব্যক্ত করেন। এই অনুষ্ঠানে খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের সদর জনাব মুনাদিল ফাহাদ উপস্থিত ছিলেন।

একসাথে মসজিদের প্রথম তলায় আতফাল সম্মেলনের কার্যক্রম পবিত্র কুরআন ও নযম পাঠের মাধ্যমে শুরু হয়। এতে প্রায় ৪০০ আতফাল উপস্থিত ছিলেন। আতফাল সম্মেলনে বিভিন্ন বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর এবং প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের চেয়ারম্যান ও সিইও জনাব আহসান খান চৌধুরী।

রাজশাহী মজলিসের খাদেম জনাব রবিউল ইসলাম রবিন সাইকেল চালিয়ে ভারত ভ্রমণ করেন। তার ভ্রমণ কাহিনীও ইজতেমায় আগত সকলের সাথে শেয়ার করেন। তার এ কৃতীত্বের জন্য সদর মজলিসের পক্ষ থেকে তাকে বিশেষ সম্মাননা পুরস্কার প্রদান করা হয়।

এবারের ইজতেমায় বিশেষ আকর্ষণ ছিল যারাই শুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত করতে পারবে এবং অর্থসহ সম্পূর্ণ নামায পড়তে পারবে তাদের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছিল আকর্ষণীয় পুরস্কার। এতে শুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগীতা এবং অর্থসহ নামাযে অংশ নিয়ে প্রায় পাঁচশ জন খোদ্দাম পুরস্কার প্রাপ্ত হন। একই সাথে যারা তিনটি তালিমী প্রতিযোগীতায় অংশ নিয়েছে তাদের জন্যও ছিল বিশেষ পুরস্কার।

ইজতেমায় ১০টি মজলিস থেকে খোদ্দামুল আহমদীয়া ও আতফালুল আহমদীয়া দেয়ালিকা প্রদর্শনীতে অংশ নেয়। যেসব মজলিস এবার তাদের কার্যক্রমের জন্য উত্তম মজলিস হিসেবে পুরস্কার গ্রহণ করেছেন তারা হলেন- তারুয়া মজলিস শ্রেষ্ঠ আতফাল মজলিস হিসেবে পুরস্কার প্রাপ্ত হন। আলমে ঈনামী পুরস্কার লাভ করেন চট্টগ্রাম মজলিস। উত্তম মজলিস হিসেবে (খোদ্দাম) পুরস্কার লাভ করেন- খুলনা, নারায়ণগঞ্জ, তারুয়া ও

ব্রাহ্মণবাড়িয়া মজলিস। উত্তম আতফাল মজলিস হিসেবে পুরস্কার লাভ করেন– শালশিড়ি, খুলনা, ঘাটুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং চট্টগ্রাম।

এছাড়া উত্তম রিজিওনাল মজলিস হিসেবে পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েছেন চট্টগ্রাম-সিলেট রিজিওন, রংপুর রিজিওন এবং রাজশাহী রিজিওন। এছাড়া উত্তম জেলা মজলিস হিসেবে পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েছেন দিনাজপুর জেলা, সিলেট জেলা, রাজশাহী জেলা ও রংপুর জেলা।

৬ অক্টোবর বিকালে ইজতেমার সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে বক্তব্য রাখেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর সাহেব এবং নাযেম আলা সাহেব। পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তি ঘটে।

এবারের ইজতেমায় ৭৯টি মজলিস থেকে ১২০০ খোদ্দাম ও ৬০৮জন আতফাল অংশগ্রহণ করেন। পঞ্চগড় থেকে ট্রেনের একটি বগি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও তারুয়া মিলে ট্রেনের একটি বগি রিজার্ভ করে ইজতেমায় যোগদান করেছেন। এছাড়া সুন্দরবন, মিরগাং, রংপুর জেলা এবং নাটোর জেলা থেকেও বাস রিজার্ভ করে ইজতেমায় যোগদান করেছেন।

এবারের ইজতেমায় খেলাধুলার জন্য আলাদা মাঠ ভাড়া করা হয়। যার ফলে যথা সময়ে খেলাধুলা সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়। ইজতেমায় দেয়ালিকা ও প্রকাশনার বিভাগের পক্ষ থেকে বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এছাড়া ইজতেমায় আগত সবাইকে শরবত পান করানোরও ব্যবস্থা ছিল। ইজতেমার বিভিন্ন তালিমী প্রতিযোগিতার জন্য ২৫জন ওয়াকেফে যিন্দেগী বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন।

ইজতেমা উপলক্ষ্যে ইশায়াত বিভাগের পক্ষ থেকে বিশেষ ইজতেমা বুলেটিন প্রকাশ করা হয়। যাতে হুযূর (আই.)-এর ৪ অক্টোবরের খুতবার সারসংক্ষেপ প্রকাশ করা হয় এবং ইজতেমায় আগত প্রায় সকলের কাছে তা বিনামূল্যে পৌঁছানো হয়। ইজতেমায় নতুনভাবে মাসিক আহ্বানের গ্রাহক হয় ১০৩জন।

ইজতেমায় খাদ্য বিভাগ অত্যন্ত পরিশ্রম করে খুব সুশৃঙ্খল ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নভাবে খাবার বিতরণের কাজটি সম্পন্ন করেন। অনেক আতফালও এ কাজে অংশ নেন। ইজতেমা শেষে যাত্রা পথে খাবারের যেন কষ্ট না হয় সেজন্য বিশেষ প্যাকেটে খাবার নেয়ারও ব্যবস্থা ছিল। ইজতেমায় বা'জামাত তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের ব্যবস্থা ছিল।

মাহমুদ আহমদ সুমন

মজলিস আনসারুল্লাহ চট্টগ্রামের ২ দিনব্যাপী ৪২তম স্থানীয় ও জেলা ইজতেমা অনুষ্ঠিত

অনুষ্ঠিত গত ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর ১৯ তারিখে মজলিস আনসারুল্লাহ চট্টগ্রামের উদ্যোগে মসজিদ বাইতুল বাসেত চট্টগ্রামে ৪২ তম বার্ষিক স্থানীয় ও জেলা ইজতেমা ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। এতে আনসারুল্লাহ বাংলাদেশের সম্মানিত সদর জনাব আলহাজ্ব আহমদ তবশির চৌধুরী সাহেব ও নায়েব সদর আউয়াল জনাব আলহাজ্ব নাজির আহমেদ সাহেব উপস্থিত ছিলেন। উক্ত ইজতেমায় চট্টগ্রাম, কুঠির হাট, ফাজিলপুর ও মাহিল্ল্যা মজলিসের প্রায় ৮০ জন আনসার সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

২ দিনব্যাপী এই ইজতেমায় ৫/৯/২০১৯ ইং বৃহস্পতিবার বিকেল ৫ ঘটিকার সময় হতে বিভিন্ন মজলিসের আগত আনসার সদস্যদের নিবন্ধনের মাধ্যমে ইজতেমা কার্যক্রমের শুভ সূচনা করা হয়।

৬ সেপ্টেম্বর ভোর ৪ ঘটিকা হতে বেদারী, তাহাজ্জুদ ও ফজরের নামাযের মাধ্যমে ইজতেমার ১ম দিন শুরু হয়। ১ম দিন সকাল ৯টায় জাতীয় পতাকা, মজলিস পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে ২ দিনব্যাপী ৪২ তম স্থানীয় ও জেলা ইজতেমার আনুষ্ঠানিক শুভসূচনা ঘটে। এই সময় উপস্থিত ছিলেন আনসারুল্লাহ বাংলাদেশের সম্মানিত সদর সাহেব, অতিথিবৃন্দ, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যাক্তি ও বিভিন্ন মজলিস হতে আগত আনসার সদস্যবৃন্দ।

ইজতেমার ১ম অধিবেশন শুরু হয় সকাল ১০ ঘটিকার সময়। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় আমীর জনাব মোর্শেদ আলম সাহেব। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মজলিস আনসারুল্লাহ বাংলাদেশের সম্মানিত সদর জনাব আলহাজ্ব আহমদ তবশির চৌধুরী সাহেব।

শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব শাহজাহান চৌধুরী সাহেব। নযম পেশ করেন জনাব গিয়াস উদ্দিন আহমদ সাহেব। বক্তৃতা পর্বের প্রথমে স্থানীয় যয়ীমে আলা জনাব এম আরিফুজ্জামান সাহেব বার্ষিক রিপোর্ট উপস্থাপন করেন। পরবর্তীতে প্রধান মেহমান সম্মানিত সদর সাহেব বিশেষ নসীহত ও নির্দেশনা মূলক বক্তব্য প্রদান করেন। পরে সভাপতির ভাষণের মাধ্যমে প্রথম অধিবেশন শেষ হয়।

জুমুআর নামায ও দুপুরের খাবারের বিরতির পর বিকাল ৩ ঘটিকার সময় ২য় অধিবেশন শুরু হয়। এতে যথারীতি সদর আনসারুল্লাহ্ সভাপতির আসন অলংকরণ করেন। আরো উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি নায়েব সদর আউয়াল জনাব আলহাজ্ব নাজির আহমদ সাহেব। এই পর্বে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন জনাব হাশেম আহমদ সাহেব। নযম পেশ করেন জনাব এস এম শহিদউল্ল্যাহ সাহেব। পরবর্তীতে ইজতেমা কমিটির চেয়ারম্যান ও জেলা নাযেমে আলা জনাব খালিদুর রহমান ভুঁইয়া সাহেব অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। অতঃপর 'নাহনু আনসারুল্লাহ' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন এম আরিফুজ্জামান সাহেব। শেষ পর্যায়ে সম্মানিত সদর সাহেব আম মজলিস পরিচালনার মাধ্যমে সবার সাথে কথা বলেন। পরবর্তীতে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় এম.টি.এ'র মাধ্যমে সবাই হুযূর (আই.)-এর খুতবা সরাসরি দেখেন এবং শুনেন।

৭/৯/১৯ ইং শনিবার সকাল ৯টা হতে ইজতেমায় আগত আনসার সদস্যদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ইজতেমার ২য় দিনের কার্যক্রম শুরু হয়। প্রতিযোগিতাগুলোর মধ্যে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত, নযম, বক্তৃতা, ঝুড়িতে বল নিক্ষেপ, শর্টবার ফুটবল, কুইজ ও লিখিত পরীক্ষা উল্লেখযোগ্য।

পুরস্কার বিতরণ ও সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয় শনিবার বিকাল ২ ঘটিকার সময়। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সম্মানিত সদর সাহেব। যথারীতি কোরআন তেলাওয়াত ও নযম পেশ করার পর সাংগঠনিক দিকনির্দেশনা মূলক বক্তব্য রাখেন নায়েব সদর আউয়াল জনাব আলহাজ্ব নাজির আহমদ সাহেব। আরো বক্তব্য রাখেন মুরুব্বি সিল্‌সিলাহ জনাব জাফর আহমদ সাহেব। তিনি তার যুক্তরাজ্য সফরের বিভিন্ন দিক ও হুযূরের সান্নিধ্যের বিভিন্ন কথা তুলে ধরেন। আরো বক্তব্য রাখেন রিজিওনাল নাযেমে আলা জনাব এম এ ফয়েজ সাহেব। জেলা নাযেমে আলা জনাব খালেদুর রহমান ভুঁইয়া সাহেব ইজতেমায় আগত সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে বক্তব্য রাখেন।

সবশেষে সভার সভাপতি, আনসারুল্লাহ বাংলাদেশের সম্মানিত সদর সাহেব দিকনির্দেশনা মূলক বক্তব্য রাখেন। অতঃপর পুরস্কার বিতরণ, আহাদপাঠ ও ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে ২ দিনব্যাপী ৪২ তম স্থানীয় ও জেলা ইজতেমার আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মুহাম্মদ শামসুদ্দীন হেলাল
মজলিস আনসারুল্লাহ, চট্টগ্রাম

নারায়ণগঞ্জ ও রাজশাহীর আঞ্চলিক ওয়াকফে নও সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ১১/১০/২০১৯ইং রোজ শুক্রবার সারাদিন ব্যাপী নারায়ণগঞ্জে আঞ্চলিক ওয়াকফে নও সম্মেলন, ঢাকা দক্ষিণ জোনের অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রোগ্রামে ঢাকা দক্ষিণ জোনের ওয়াকফে নও ছেলে মেয়ে ও তাদের পিতা-মাতাগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রোগ্রামে বক্তৃতা প্রদান করেছেন মোহতরম হাসিব আহসান রতন, ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও।

গত ১৮/১০/২০১৯ইং রোজ শুক্রবার সারাদিন ব্যাপী আঞ্চলিক ওয়াকফে নও সম্মেলন, রাজশাহী জোনের অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রোগ্রামে রাজশাহী জোনের ওয়াকফে নও ছেলে মেয়ে ও তাদের পিতা-মাতাগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রোগ্রামে বক্তৃতা প্রদান করেছেন মোহতরম হাসিব আহসান রতন, ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও।

আবুল আতা মামুন
সহকারী সেক্রেটারী ওয়াকফে নও

বিবাহ সংবাদ

–রিশতানাতা বিভাগ

- গত ০৫/০৯/২০১৯ তারিখ মোসাম্মৎ জুয়েনা সুলতানা নেভী, পিতা: মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, গ্রাম: চর সন মানিয়া, পো: সনমানিয়া থানা: কাপাসিয়া, গাজীপুর-এর সাথে মোহাম্মদ বশির আহমদ, পিতা: মোহাম্মদ আলী আহমেদ, গ্রাম: সুলতানপুর, চরসিন্দুর, পলাশ, নরসিংদী-এর বিবাহ ২,০০,০০০/- (দুইলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৬১৮।
- গত ১১/১০/২০১৯ তারিখ মোসাম্মৎ লিজা আক্তার, পিতা: মোহাম্মদ হাম্‌দু মিঞা, গ্রাম: খানপাড়া, শালশিড়ী, ফুলতলা, বোদা, পঞ্চগড়-এর সাথে মোহাম্মদ আতাহিয়ার রহমান পিতা: মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, পূর্ব কোমর নই, মিয়া পাড়া- এর বিবাহ ২,০০,০০০/- (দুইলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৬১৯।
- গত ০৫/১০/২০১৯ তারিখ মোসাম্মৎ সানজিদা ইসলাম মৌকি, পিতা: খন্দকার আনারুল ইসলাম, বদলাগাড়ী, সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা-এর সাথে মোহাম্মদ ইফতেখার আহমদ, পিতা- মোহাম্মদ বশির উদ্দীন আহমেদ, তেবাড়িয়া, নাটোর-এর বিবাহ ৩,০০,০০০/- (তিনলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৬২০।
- গত ১১/১০/২০১৯ তারিখ নাজমা খাতুন, পিতা: মৃতঃ আব্দুল লতিফ, গ্রাম+পো: দিলালপুর, থানা: বদরগঞ্জ, জেলা: রংপুর-এর সাথে জুলফিকার আহমেদ, পিতা: মোহাম্মদ আব্দুস সালাম, গ্রাম: পাল্টাপুর, পো: শ্যামপুর, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর-এর বিবাহ ১,২৫,০০০/- (একলক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৬২১।
- গত ২৮/০৮/২০১৯ তারিখ স্মৃতি খাতুন, পিতা- শহিদুল হক মরহুম, তেবাড়িয়া উত্তর পাড়া, নাটোর ৬৪০০-এর সাথে মুরছালিন আহমদ, পিতা- গোলাম হোসেন, রমজানবেগ, মুন্সিগঞ্জ-এর বিবাহ ৯৯,৯৯৯/- (নিরানব্বই হাজার নয় শত নিরানব্বই) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৬২২।
- গত ০৬/০৯/২০১৯ তারিখ ফাহমিদা আখতার মুনমুন, পিতা- মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম ভুঁইয়া মরহুম, লতিবাবাদ, ডুবাইলন, কিশোরগঞ্জ-এর সাথে ডা. নূর উদ্দীন আহমেদ, পিতা-মহিউদ্দিন আহমদ, মিরপুর-২, ঢাকা-এর বিবাহ ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৬২৩।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর হাতে

বয়আত গ্রহণের দশটি শর্ত

১

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তঃকরণে অঙ্গীকার করবে, এখন হতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্ক হতে পবিত্র থাকবে।

২

মিথ্যা, ব্যভিচার, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, যুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হতে দূরে থাকবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যতই প্রবল হোকনা কেন, তার শিকারে পরিণত হবে না।

৩

বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসূল (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, সাধ্যানুযায়ী তাহাজ্জুদ নামায পড়বে, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি দরূদ পাঠ করবে, প্রত্যহ আল্লাহ্ তা'লার সমীপে নিজের পাপসমূহের ক্ষমা প্রার্থনা করবে আর প্রতিনিয়ত ইস্তেগফার করায় মনোনিবেশ করবে। ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে তাঁর অপার অনুগ্রহ স্মরণ করে তাঁর প্রশংসা ও বড়াই করবে।

৪

উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

৫

সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তা'লার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থায় তকদীরের বিধানের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তাঁর পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে। কোন বিপদ উপস্থিত হলে পশ্চাদপদ হবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হবে।

৬

সামাজিক কদাচার পরিহার করবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হবে না। কুরআনের অনুশাসন সম্পূর্ণরূপে শিরোধার্য করবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে।

৭

অহংকার ও গর্ব সর্বতোভাবে পরিহার করবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার, সহিষ্ণু ও দরবেশী জীবন যাপন করবে।

৮

ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হতে প্রিয়তর জ্ঞান করবে।

৯

আল্লাহ্ তা'লার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর সৃষ্ট জীবের সেবায় যত্নবান থাকবে এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করবে।

১০

আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের সাথে যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হলে, জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তাতে অটল থাকবে। ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এতো বেশি গভীর ও ঘনিষ্ঠ হবে, জগতের কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মাঝে এর তুলনা পাওয়া যাবে না।

(মজমুআ ইশতেহারাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৯-১৯০, ১২ জানুয়ারি ১৮৮৯)

New Vol. No. 82 | 9th Issue

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

15th November, 2019 | Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

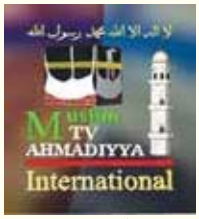

mta
INTERNATIONAL
এমটিএ দেখুন
অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন
০১৯১২-৭২৪৭৬৯

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং ভোর-রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

জলই জীবন/ WATER THERAPY

জল চিকিৎসায় নিম্নবর্ণিত রোগসমূহ নিরাময় হয় :

(১) কোষ্ঠ কাঠিন্য (Constipation)- ১০ দিন পর এই চিকিৎসায় সর্বপ্রথম ফল পাবেন, (২) পাকাশয়জনিত রোগসমূহ (Gastric Problems)- ১০ দিন, (৩) উচ্চ রক্তচাপ (Hipertension)-১ মাস, (৪) বহুমুত্র (Diabetes)-১ মাস, (৫) ক্ষয়রোগ (Tuberculosis)-৩ মাস, (৬) চক্ষুকর্ণ নাসিকা রোগ (ENT Diseases)-৩ মাস, (৭) মুত্রথলী গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ (Enlargement of Prostate Gland)-৩ মাস, (৮) কর্কট রোগ (Cancer)-প্রথম থেকে রোগ ধরা পরলে ৬ মাস, (৯) পুরনো কঠিন চর্মরোগ-১ বছর।

জল চিকিৎসার নিয়ম :

(১) ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে কুলকুচি না করে (without mouth washing) শান্তভাবে ধীরে ধীরে ১.২৬০ লিটার অর্থাৎ বড় গ্লাসের ৪ গ্লাস জল পান করতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। জলপান করার পর ৪৫ মিনিট কোন তরল বা শক্ত খাদ্য (Liquid or solid food) খাওয়া যাবে না। ধূমপান করা যাবে না।

(২) প্রাতঃরাশ, দুপুর ও রাতের আহার (Breakfast, Lunch and Dinner) করার সময় জল পান করা যাবে না। অসুবিধা হলে গলা ভেজাবার জন্য ২/৩ চামচ পরিমাণ জল খেতে পারেন। এই পরিমাণ বাড়ানো যাবে না। দুই ঘন্টা পর ইচ্ছেমত জল পান করা যাবে, দুর্বল বা অসুস্থ হলে চার গ্লাসের পরিবর্তে ১ অথবা ২ গ্লাস দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে অবশ্যই চার গ্লাস পান করতে হবে। যে কোন রোগই জল চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে। বাতজনিত রোগে প্রথম ৭ দিন সকালে ও বিকালে ২ বার এই চিকিৎসা করতে হবে। উপশমের পর শুধু সকালে করলে চলবে।

(৩) দুপুর ও রাত্রে আহার করে শোয়ার পূর্বে অন্ততঃ আধাঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ঘুমানোর পূর্বে কোন কিছু আহার করা যাবে না। অসুবিধা মনে হলে ঘুমানোর আগে ২/৩ চামচ জল পান করা যাবে।

ধানসিড়ি রেস্টুরেন্ট

ধানসিড়ি রেস্টুরেন্ট
দোতলা
রোড নং-৪৫, প্লট-৩৩, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫
মোবাইল: ০১৭০০৮৩৩২৫২, ০১৯৩০২১৪২৮৪

Printed and Published by **Alhaj Mahbub Hossain M.A.** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 57300808, 57300849, Fax: 0088-2-57300880, e-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com
www.theahmadi.org (Pakkhik Ahmadi web site live now)